ইউনিট ৬

খোলাফায়ে রাশেদীন

ভূমিকা

খিলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মজিদ খাদ্দুরীর ভাষায় "খিলাফত হলো ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামো।" খিলাফম শব্দটির উৎপত্তি 'খলিফা' শব্দ থাকে। ইবনে খালদুনের মতে, হজরত মুহাম্মদ (স) এর উপর যারা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে তাঁর আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাদের খলিফা বলা হয়।' খলিফা পরিচালিত রাষ্ট্রই হল খিলাফত। মহানবী (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী প্রজাতন্ত্র পরিচালনার মাধ্যমেই খিলাফত নামক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা হয়। মহানবীর মৃত্যুর পর সে সকল বিশিষ্ট সাহাবী আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুবাবে পরিচালনা করে গেছেন তারা 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বা সত্যপথগামী খলিফা নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন-

১. *হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)*
২. *হযরত উমর ফারুক (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)*
৩. *হযরত উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) এবং*
৪. *হযরত আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)*

উক্ত চারজন খলিফা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (স) ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁরা নবীর (স) শিক্ষা ও আদর্শের পুক্সখানুপুক্সখ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁদের শাসন ছিল ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। ধর্ম ও রাজনীতির সকল দিকে তাঁরা ছিলেন নবী (স)-এর সত্যিকার উত্তরসূরী। তাঁদের ত্রিশ বছরের খিলাফত কালই ইসলামী শাসনব্যবস্থার আদর্শ সোনালী যুগ। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের মাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হল :

প্রশাসনঃ *খলিফা ছিলেন প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। শূরা বা উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।*

নির্বাচন পদ্ধতি ঃ *খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন।*

এ যুগের নির্বাচন পদ্ধতি দুটো। একটি সরাসরি নির্বাচন যেমন হযরত আবু বকর (রা) প্রথম খলিফা হিসেবে জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হল নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন দান। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, শিক্ষিত, ন্যায়বান, আদর্শবান কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে খলিফাগণ মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতেন। খলিফার মৃত্যুর পর তাঁরা পরবর্তী যোগ্য লোকদের মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচন করতেন। এ পদ্ধতিতে হযরত উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদর্শ বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলী একজন খোদাভীরু, সৎ, যোগ্য, পদের প্রতি লোভহীন সাহসী, কর্মঠ, সংযমী, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। সকলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। প্রশাসক বা কোন দায়িত্বশীল পদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে সে আমলে মনোনয়ন দান করা হত সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে। কারণ জাতীয় স্বার্থকেই তাঁরা বড় করে দেখতেন।

খলিফাদের বেতন-ভাতাঃ *খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের কোন বেতন দেয়া হত না সরকারি অর্থে বা বাইতুল মালে তাদের কোন প্রকার দাবি ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণের মত সরকারি ভাতা গ্রহণ করে তারা সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। অবশ্য তাঁরা অনেকেই এ ভাতা মৃত্যুর আগে নিজ সম্পত্তি থেকে বাইতুল মালে ফেরৎ দিয়ে গেছেন।*

জীবনযাত্রা ঃ *খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। খলিফাগণ মসজিদে বসেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।*

এই ইউনিটে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এক নজরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল

খলিফা	খেলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা)	১৩ই বরিউল আউয়াল ১১ হি.	২২শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর ফারুক (রা)	২৩শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২৬শে যিলহজ্জ ২৩ হিজরি	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা)	১লা মুহাররম ২৪ হিজরি	১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা)	২৪শে যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১৭ই রমযান ৪০ হিজরি	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হযরত ইমাম হাসান (রা)	২২শে রমযান ৪০ হিজরি	রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি	৬ মাস ৮ দিন

ঐতিহাসিকগণ হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর ৬ মাসের শাসনামলকেও খিলাফতে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করেন।

হযরত আবু বকর (রা) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবেন
- খিলাফতপূর্ব জীবনে ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা)-এর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত লাভের বিবরণ দিতে পারবেন
- খিলাফত লাভের পর হযরত আবু বকরের (রা) প্রথম ভাষণটি উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রাথমিক ও খিলাফত লাভ

মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। ইসলামে নবীর পরেই তাঁর স্থান। ইসলাম গ্রহণের আগেও তিনি অন্যান্যদের মত জাহেলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলেন না। পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন তিনি।

তিনি আজীবন রাসুলুল্লাহর পাশে ছিলেন ছায়ার মত। নবুওয়াতের আগে ও নবুওয়াত লাভের পরে নবী মুহাম্মদ (স)-কে সমানভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবন-চরিত্র আরও উন্নততর হয়ে উঠে। প্রাথমিক জীবনে তিনি মানবতার সেবা করতেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি আরও বেশি দুর্গত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইসলামের সেবায় তিনি তাঁর সমুদয় ধন-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর মূল নাম আবদুল্লাহ। উপনাম ছিল আবু বকর। 'আতিক' ও 'সিদ্দীক' ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর পিতা হলেন ওসমান ওরফে আবু কুহাফা এবং মাতা ছিলেন সালমা ওরফে উম্মুল খায়ের। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশের 'তাইম' গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রায় তিন বছরের ছোট ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম পূর্ব যুগে বিরাট ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার সিরিয়া ও ইয়েমেন সফর করেন। তিনি কুরাইশ বংশের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র টাইম-এর বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের যিম্মাদার ছিলেন। রক্তপণ আদায়ের যিম্মাদারী তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। সে যুগে মক্কায় অল্প

যে কয়জন ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন, আবু বকর (রা) ছিলেন তাদের অন্যতম। বংশপঞ্জী বিষয়ে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল।

সমবয়সী ও একই প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে হযরত আবু বকর ও রাসূলুল্লাহর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। হাফিয ইবনে হাজার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা) বাহিরা রাহিবের ঘটনার পর হতেই নবী (স)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত হযরত আবু বকর (রা)-এর সিরিয়া সফরে নবী (স) তাঁর সাথী ছিলেন। নবী (স)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রা)-এর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে হযরত আবু বকর (রা) মধ্যস্থতা করেছিলেন।

স্বভাব-চরিত্র

বাল্যকাল থেকেই আবু বকর (রা) উত্তম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও মূর্তিপূজা ও মদ্যপান করতেন না। আবু বকরের প্রকৃতি ছিল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। সমবয়সী ও একই স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে হযরত মুহাম্মদ (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এই সম্পর্ক এত নিবিড় হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন- আমাদের এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন রাসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে পদার্পন করেননি।

আতিক ও সিদ্দীক উপাধির কারণ

মহানবী (স) একদিন তাঁকে বলেছিলেন- "তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকবে।" ঐ সময় হতে তাঁর উপাধি 'আতিক' হয়। মিরাজের রাতে নবী (স) জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোত্রের কোন ব্যক্তি এই ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করবে? জিবরাঈল উত্তর দিলেন- আবু বকর। কেননা তিনি "সিদ্দীক" সত্যবাদী। এথেকে তিনি সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুহাম্মদ (স) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহর নিকট থেকে ঐশী বাণীর মাধ্যমে নবুওয়াত লাভ করেন। এ সময় তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়েমেনে ছিলেন। সেখানে থেকে ফিরে তিনি মহানবী (স) এর সাথে সাক্ষাৎ করে হৃষ্ট চিত্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা)ই প্রথম ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজা এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান।

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের সেবায় তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেন। তিনি হযরত বেলাল সহ অনেক দাস-দাসীকে স্বীয় অর্থে ক্রয় করে মুক্তি দিয়ে মনিবদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হযরত ওসমান, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান ও সাদ প্রমুখ গণ্য মান্য ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি একদা প্রহৃত হয়েছিলেন। তবুও ইসলামের পথ থেকে সরে যাননি।

তিনি ছিলেন মহানবী (স) এর অতি ঘনিস্ট জন। হিযরতের সময় হযরত (স) তাঁকেই সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মদীনার মসজিদ, হযরতের বাসগৃহ নির্মাণ, তাবুক অভিযান এবং ইসলামের সার্বিক খেদমতের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি সুখে-দুখে হযরত (স) কে ছায়ার মত অনুসরণ করেন। তিনি মহানবীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি।

খলিফা নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ (স) ইনতিকালের পূর্বে কাউকে খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। তাঁর কোন পুত্র সন্তানও ছিল না। ওফাতের পর ইসলামি জাহানের খলিফা কে হবে- এই প্রশ্ন নিয়ে মুসলমানগণ আনসার ও মুহাজির দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় দলই তাদের মধ্য হতে খলিফা নির্বাচনের দাবি করেছিল।

মুহাজিরদের কথা হল 'খিলাফত আমাদেরই প্রাপ্য। যেহেতু আমরা নবীর আহাল, আমরা পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে তাঁর সাথে হিজরত করছি।' আনসারদের যুক্তি ছিল- 'খিলাফত আমাদেরই প্রাপ্য, যেহেতু আমরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি এবং সাহায্য করেছি।'

ছাকীফায়ে বনী সায়েদায় বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। এ সংবাদ পেয়ে আবু বকর (রা) এবং উমর (রা) নির্বাচন প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাফনের পূর্বেই মীমাংসা হওয়া উচিত বলে মনে করলেন। তাঁরা আবু ওবায়দাহসহ ছাকীফায়ে বনী সায়েদায় পৌঁছেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে আনসাররা তাঁদের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। তখন আবু বকর (রা) উপস্থিত জনতার নিকট উমর বা আবু ওবায়দাকে খলিফা মনোনয়নের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ই আবু বকর (রা)-এর অনুকূলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর মুহাজিরদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম উমর (রা) এবং আনসারদের মধ্য হতে বশীর ইবনে সা'দ আবু বকর (রা)-এর হাত ধরে বাইআত (আনুগত্য শপথ) করলেন। তারপর উপস্থিত বাইআত (শপথ) করেন। অতঃপর মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাফন-কাফনের কাজে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় দিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বাইআত হয়।

খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকরের প্রথম ভাষণ

বাইআতের পর প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে মুসলমানগণ! আমাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি ভাল কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন, যদি অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে যাই, আমাকে সঠিক পথে এনে দিবেন। শাসকদের নিকট সত্য প্রকাশ করাই উত্তম আনুগত্য। সত্য গোপন রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল... যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করে না, তারা লাঞ্ছিত অভিশপ্ত হয়। যে জাতির মধ্যে খারাপ কাজ ব্যাপক হয়, তাদের উপর আল্লাহ বালা-মুসীবত ব্যাপক করে দেন।'

হযরত আবু বকর (রা) গণতান্ত্রিক পন্থায়ই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) রোগ শয্যায় শায়িত থেকে তাঁকে নামাযের ইমামতির ভার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁর তিরোধানের পর আবু বকর খিলাফত প্রাপ্ত হবেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন।

ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব,

স্বধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ,

যাকাত অস্বীকারকারীদের গোলযোগ।

এছাড়াও উসামা ইবনে যায়েদের ঘটনা, যাকে রাসূল (স)-এর আপন জীবদ্দশায় মূতার যুদ্ধের শহীদানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিরিয়া হামলার শুধু আদেশই দেননি, নিজ হাতে তাঁর পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। এতে অধিকাংশ বড় সাহাবীর অংশগ্রহণের নির্দেশ ছিল। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় সেনাবাহিনীর মদীনার বাইরে যাওয়া কম বিপদজ্জনক ছিল না। দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্যার সাফল্যজনক মোকাবেলা করেছিলেন।

মূলত তখন সঙ্কটের এক পাহাড় যেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলিফার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর মুসলমানদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যদি আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে আমাদের উপর করুণা না করতেন, তা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর আমার পিতার উপর এমন সব আকস্মিক বিপদ আপতিত হয় যে, যদি তা কোন বিরাট পাহাড়ের উপরে নাযিল হত তা হলে সে পাহাড়ও টুকরা টুকরা হয়ে যেত। একদিকে মদীনায় মুনাফিকদের উৎপত্তি, অন্যদিকে আরবের প্রায় সর্বত্র ইসলাম ত্যাগের হিড়িক।"

সার-সংক্ষেপ

মক্কায় বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে হযরত আবু বকর (রা) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আবু কুহাফা এবং মা ছিলেন উম্মুল খায়ের। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমবয়সী এবং বন্ধু। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তাঁর জীবন ও সম্পদ সবকিছুই বিলিয়ে দেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান সাহাবী। বিশ্বনবীর (স) ইনতিকালের পর তাঁকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তিনি ছোট বেলা থেকেই পূত-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তাঁর সত্যবাদিতা ও রাসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বস্ততার কারণে তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকরের বংশ এবং গোত্রের নাম ছিল-
   ক. কুরাইশ বংশের তাইম গোত্র
   গ. কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্র
   গ. উমাইয়া বংশের মুত্তালিব গোত্র
   ঘ. খাযরাজ বংশের আউস গোত্র।

২. ইসলাম গ্রহণের আগেও হযরত আবু বকর ঘৃণা করতেন-
   ক. মুর্তি বানানোকে খ. মূর্তি পূজা ও মদ্যপান
   গ. জুয়া খেলাকে ঘ. পৌত্তলিকতাকে

৩. যে ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে হযরত আবু বকর (রা) সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন-
   ক. হাজরে আসওয়াত বসানো ঘটনাকে খ. নবুওয়াত লাভের ঘটনাকে
   গ. মি'রাজের ঘটনাকে ঘ. কুরআন নাযিলের ঘটনাকে।

৪. হযরত আবু বকর (র)-এর খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিটি ছিল-
   ক. গণতান্ত্রিক খ. নিজে নিজে
   গ. ক্ষমতা দখল কার ঘ. সকলের অমতে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকরের (রা) পরিচয় দিন।
২. হযরত আবু বকরের (রা) প্রাথমিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩. হযরত আবু বকরের (রা) ইসলাম গ্রহণের বিষটি উল্লেখ করুন।
৪. হযরত আবু বকর (র)-এর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?
৫. হযরত আবু বকর (রা) কিভাবে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন?
৬. খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকরের (রা) প্রথম ভাষণ কি ছিল?

রিদ্দা বা স্বধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিদ্দা যুদ্ধ বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন।
- রিদ্দার যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন
- ভণ্ড নবীদের কিভাবে দমন করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন
- রিদ্দার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আবু বকরের (রা) স্বল্পকালীন খিলাফতের বেশীর ভাগ সময় রিদ্দার (স্বধর্ম ত্যাগের) যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। বস্তুত মহানবী (স) এর মৃত্যুর পর হেজাজ প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব দেশ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসময় কতিপয় ভণ্ড নবীর উদ্ভব ঘটে। মুসলমানদের একদল যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সমগ্র আরবে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। ইসলামের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে। ইহুদি-খ্রিস্টানগণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সর্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। শীতের রাতের রাখাল বিহীন মেষ পালনের ন্যায় মুসলমানগণ চরম দুর্দশরায় নিপতিত হয়। মূলত মহানবীর (স) মৃত্যুর পর ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ এবং ভণ্ড নবীদের পরিচালিত আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে 'রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন' এবং এ আন্দোলন দমনে হযরত আবু বকর (রা) ঘোষিত যুদ্ধ 'রিদ্দা যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

রিদ্দা যুদ্ধের কারণ

ইসলাম প্রসারে বিঘ্ন ঃ রাসূল (স)-এর ইনতিকালের পূর্বে আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও জীবনাদর্শের মূল অনুশাসন সম্পর্কে তাদের অনেকেই অজ্ঞ ছিল। এছাড়া দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা, যোগাযোগের অভাব, সময়ের স্বল্পতা, সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম প্রচারের অভাবে এসব লোকজন ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

মদীনার প্রাধান্য ঃ রাসূলের জীবদ্দশায়ই মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তাঁর ইন্তিকালের পর মক্কায় একশ্রেণীর লোক ও অন্যান্য কুচক্রীমহল মদীনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে বসে।

ব্যক্তি স্বার্থে আঘাতঃ আরববাসীদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের লোভ ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে এসব বিলীন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য-মৈত্রীর সুমহান আদর্শ। ফলে বেদুঈনদের মনে দারুণ আঘাত হানে। তারা যেহেতু গোত্রের দলপতিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করতো, তাই গোত্রপতির ধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে তারাও ধর্মত্যাগী হয়ে বিদ্রোহ করে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ঃ নবুওয়াতের পদ ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তাই কতিপয় লোক সম্মান ও পদমর্যাদার লোভে মিথ্যা নবুওয়াতী দাবি করে। আর মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আরববাসীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিরোধিতাঃ প্রাক ইসলামী যুগে আরবে এমন কোন অন্যায় কাজ ছিল না যা আরববাসীরা করতো না। রাসূল (স) ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল স্তরে আমূল পরিবর্তন করে শতধা বিচ্ছিন্ন একটি জাতিকে সুশৃঙ্খল সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেন। এতে বেদুইনরা খুশি হতে পারেনি। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর স্বার্থপর বেদুঈনরা ইসলামের বিধানের বিরোধিতা শুরু করে।

ইসলামের নৈতিক অনুশাসনের বিরোধিতা ঃ ইসলামের নৈতিক অনুশাসন, রুচিসম্মত ও মার্জিত জীবনযাত্রায় স্বাধীনচেতা অনুশাসনমুক্ত আরববাসীরা অভ্যস্ত ছিল না। চিরদিনই তারা ছিল দূরন্ত বাধা-বন্ধনহীন। তাই ইসলামের সালাত, যাকাত, সাওম প্রভৃতি নৈতিক অনুশাসনকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং নিজেদের উপর এগুলোকে যুলুম মনে করলো। আর এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইসলাম ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হল।

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ঃ রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি। আরবের কতিপয় লোক মনে করলো, এ যাকাত ব্যবস্থা নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নবী যেহেতু ইনতিকাল করেছেন, তাই এর প্রয়োজন নেই। ফলে তারা আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের সময় যাকাত দিতে অস্বীকার করলো।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ ঃ এক দিকে ইসলাম ত্যাগী বেদুঈন স্বার্থান্বেষী গোত্রপতি ও ভণ্ডনবীদের অপতৎপরতা শুরু হয় অন্যদিকে বিধর্মীদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মোক্ষম সুযোগ বুঝে ইসলামের বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয়। এদের ইন্ধনে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

বিচার-বুদ্ধির অভাবঃ পরিবেশের অভাবে আরবদের মন ও মস্তিষ্ক সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ফলে বিচার-বুদ্ধি তাদের খুব কম ছিল। তারা অনেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে অস্থির খেয়ালী মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করে।

এসব কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) এ আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন।

ভণ্ডনবীদের দমন

এ সব কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। প্রথম খলিফা আবু বকর (র) এ আন্দোলনকারী কঠোরদের হাতে দমন করেন।

আসওয়াদ আনাসী ও তুলাইহাকে দমন ঃ ভণ্ডনবীদের আবির্ভাবে আবু বকর বিচলিত না হয়ে ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে বিদ্রোহরত সকল অঞ্চলে ১১টি মুসলিম সেনাদল প্রেরণ করেন। খলিফা প্রথমে ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনাসীর সমর্থক বিদ্রোহী 'আবস' ও 'জুবিয়ান' গোত্রদ্বয়কে যুলকাশা ও রাবাজার যুদ্ধে পরাজিত করেন। আসওয়াদ আনাসী শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে আসওয়াদ আনাসী ও তার সমর্থক গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এরপর খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করা হয় তুলাইহা ও তার সমর্থক বিদ্রোহী তামিম ও ইয়ারবু গোত্রদ্বয়কে দমন করার জন্য। খালিদ সাফল্যের সাথে এ গোত্রদ্বয়কে পরাজিত করে তুলাইহাকে দমন করেন। খলিফার নির্দেশে তুলাইহা বহু অনুচরসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

মুসাইলামা ও সাজাহকে দমন ঃ ভণ্ডনবীদের মধ্যে মুসাইলামা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে মহিলা ভণ্ডনবী সাজাহকে বিয়ে করে বনু হানীফা গোত্রের চল্লিশ হাজার লোকের একটি বিদ্রোহী দল গঠন করে ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। মুসাইলামাসহ হানীফা গোত্রের প্রায় দশ হাজার ধর্মত্যাগী যুদ্ধে নিহত হয়। ঐতিহাসিক 'তাবারী' একে 'মৃত্যুর বাগান' বলে উল্লেখ করেন। জোসেফ হেল বলেন, "কঠিনতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ অন্যতম।" মুসলমানদের পক্ষে বহু সাহাবী এবং তিনশত জন হাফিজ ই-কোরআন শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ওপর ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। এ যুদ্ধের পর সাজাহ বনু হানীফা গোত্রের লোকজনসহ ইসলাম গ্রহণ করে।

অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমন

সেনাপতি হোজাইফা ও ইকরামা আম্মান মহযাবের বিদ্রোহ দমন করেন। হাজরামীত্তত ও ইয়ামেনের বিদ্রোহ দমন করা হয়। বাহরাইনে মুসলিম আধিপত্য পুন:প্রতিসআ করা হয়। খলিফার নির্দেশে হযরত আলী, তালহা ও যুবায়ের যাকাত অস্বীকারকারী গোত্রসমূহকে দমন করেন। বিদ্রোহীদের পুনরায় জাকাত দানে বাধ্য করা হয়।

রিদ্দা যুদ্ধের ফলাফল

ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো ঃ মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর ইসলামের শক্তি কিছুটা কমে গেলেও আবু বকর (রা)-এর আপ্রাণ চেষ্টায় সমগ্র আরবে আবার ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের অখণ্ডতা বজায় ঃ প্রাক ইসলামী যুগে আরব বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও এলাকায় বিভক্ত ছিল। ইসলাম এসে অখণ্ড জাতি হিসেবে আরবকে মর্যাদার আসন দেয়। কিন্তু নবীজীর ইনতিকালের পর আরববাসীরা বিভক্ত হয়ে পড়লে পুনরায় আবু বকর (রা) ইসলামের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

স্থায়ী মর্যাদা লাভ ঃ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ডনবীদের ওপর জয়লাভের পর ইসলাম অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করলো।

মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি ঃ রাসূলের (স) ইনতিকালের অল্পকালের মধ্যেই ইসলামের এ ধরনের ব্যর্থতা দেখে অনেক মুসলমানের মনেও সংশয় ছিল। আবু বকর (রা)-এর দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হলে মুসলমানদের অন্তরে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রের ভিত্তি আরো মজবুত হল ঃ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে শক্ত হাতে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের দমন করা হলে এ রাষ্ট্রের শক্তি ও ভিত আরো মজবুত হয়, যা বিরোধীদের কাছে অপরাজেয় মনে হয়েছিল।

জয়ের দিগন্ত উন্মোচন ঃ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের পর আরবের বাইরে ইসলামের শক্তি সম্প্রসারণ করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আবু বকর (রা) ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। এবং এরই সাথে ইসলামের জয়ের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

পরোক্ষ ফলাফল

রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানরা নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে সামরিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী হয়। রিদ্দা যুদ্ধের সময় রোমান ও পারসিকরা সীমান্ত প্রদেশে ধর্মত্যাগীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাই পরবর্তীকালে খলিফাগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মাদের (স) ইনতিকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকরের (রা) সময়ে ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্ররোচনায় এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের উস্কানিতে বিভিন্ন গোত্রের নও-মুসলিমরা পুরোনো জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে। কোন কোন গোত্র যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের এ তৎপরতার ইসলামের ভিত কেঁপে উঠে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এসব অপতৎপরতাকে কঠোর হাতে দমন করেন। এ সময়ে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীরা যেভাবে ইসলামের বিরোধিতা শুরু করেছিল, আবু বকর (রা) যদি শক্তহাতে তা দমন না করতেন, তাহলে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়তো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. 'নবুওয়াতের পদ' ছিল-
   ক. অত্যন্ত মর্যাদা পুর্ণ খ. খুবই লাভজনক
   গ. নির্বাচিত ঘ. ধর্মীয়।

২. ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনাসী-
   ক. শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় খ. শোচনীয়ভাবে মারা যায়
   গ. ইসলাম গ্রহণ করে ঘ. দেশ ত্যাগ করে।

৩. ভণ্ডনবীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল-
   ক. আসওয়াদ আনাসী খ. তুলাইহা
   গ. সাজাহ ঘ. মুসায়লামা

৪. ঐতিহাসিক 'তারাবী' মতে 'মৃত্যুর বাগান' হচ্ছে-
   ক. ইয়ামামার যুদ্ধ খ. বদর যুদ্ধ
   গ. খন্দকের যুদ্ধ ঘ. কারবালার যুদ্ধ

৫. ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী হাফিজ-ই-কুরআন সাহাবীর সংখ্যা-
   ক. এক হাজার খ. ৩১৩ জন
   গ. সত্তর জন ঘ. তিনশত জন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রিদ্দার যুদ্ধ কি?
২. রিদ্দার যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করুন।
৩. ভণ্ডনবীদের কিভাবে দমন করা হয়েছিল লিখুন।
৪. রিদ্দার যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকরের (রা) কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন,
- ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন,
- হযরত আবু বকরের (রা) চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকরের (স) অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (স)-এর তিরোধানের পর এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তিনি ইসলামের খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে বহু আঘাত ও প্রতিকূলতার কবল থেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে রক্ষা করেন। মহানবী (স)-এর অবর্তমানে আবু বকরের (রা) মত নেতৃত্ব আবির্ভূত না হলে তখনকার সঙ্কটাবর্ত থেকে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রকে টিকানো যেত না। তিনি দৃঢ়তার সাথে মদিনা রাষ্ট্র ও ইসলামকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এ জন্য তাকে ইসলামের 'ত্রাণকর্তা' বলে অভিহিত করা হয়।

হযরত আবু বকরের (রা) চরিত্রে আমরা দেখতে পাই অসীম সাহসিকতা, আকাশের মত উদারতা, পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তা। প্রিয়নবীর (স) তিরোধানের পরপর সাধারণ মুসলমানগণ যখন সুগভীর শোকে মূহ্যমান, "কে ধরবে ইসলামের পতাকা"-এ নিয়ে যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঠিক তখন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে এ মহান বীর এগিয়ে এলেন ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখতে। ইসলামের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকারী হিসেবে আবু বকরের (রা) মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

খিলাফত লাভের পূর্বে ইসলামের সেবা

সর্বপ্রথম যে চারজন নারী-পুরুষ ইসলামে দীক্ষিত হন হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে প্রতি মুহূর্তে তিনি হযরতের পাশে ছিলেন ছায়ার মত। তিনি মহানবীর (স) মিরাজের মত অলৌকিক ঘটনায় নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করে "সিদ্দিক বা মহাসত্যবাদী" উপাধিতে ভূষিত হন। ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে এবং প্রতিটি ঘটনায়, হিজরতের সময়, মদীনার মসজিদ নির্মাণে ও সকল যুদ্ধাভিযানে রাসূলের একান্ত সঙ্গী হিসেবে পাশে ছিলেন। ইসলামের সেবায় তিনি তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ ও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছেন। রাসূলের তিরোধানের পর তিনি বিভ্রান্ত মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করেন। হযরত উমর (রা) যথার্থই বলেছেন- "আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ব্যাপারে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি।"

খিলাফত লাভ

মহানবী (স)-এর তিরোধানের পর খলিফা নির্বাচন নিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। হযরত উমরের (রা) সহযোগিতায় হযরত আবু বকর এই সংকটের আশু সমাধান করে সর্বসম্মতিক্রমে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী বিশ্বের প্রথম খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

খিলাফত লাভের পরই আবু বকরকে (রা) বেশ কতকগুলো সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা মুকাবিলা করতে হয়। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে রিদ্দার যুদ্ধ, ভণ্ডনবীদের আন্দোলন দমন, অভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তি প্রতিহত, আন্তর্জাতিক শত্রু পারস্য ও রোমানদের আগ্রাসন প্রতিহত করে ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং এ সকল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভীত না হয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে হযরত আবু বকর (রা) কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রিদ্দার যুদ্ধ পরিচালনা

হযরত আবু বকরকে (রা)-কে খিলাফতের অধিকাংশ সময় রিদ্দার যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছিল। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে পুরাতন বেদুঈন গোত্রীয় ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য যে আন্দোলন করে তা ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দা বা স্বধর্ম আন্দোলন নামে পরিচিত। আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তা-ই রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

ভণ্ডনবীদের আন্দোলন দমন

মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের সাফল্য ও মর্যাদায় আরব গোত্রপ্রধানের অনেকের মধ্যে নবুওয়াতের লোভ সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত স্বার্থান্বেষী গোত্রপতিগণ প্রতিপত্তি লাভের আশায় নিজেদেরকে নবী বলে ঘোষণা করে। এদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিল-আসওয়াদ আনাসী, মুসাইলামা কায্যাব, তুলাইহা এবং খ্রিস্টান রমণী সাজাহ। তাদের বিদ্রোহ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ ছিল। আবু বকরকে দীর্ঘসময় এদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল।

আবু বকর (রা) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে মহাবীর খালিদ, সুরাহবিল, ইকরামা, মুহাজিল আল-আলা, হুযাইফা প্রমুখ রণনায়কদের নেতৃত্বে পর্যায়ক্রমে অভিযান প্রেরণ করে সকলকে দমন করেন।

যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন

বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা ইসলামের কঠোর নৈতিক নিয়ম-কানুন ও যাকাত প্রদানের আদেশ মেনে দিতে পারেনি। তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে। খলিফা ঘোষণা করেন, "পূর্ব নিয়মানুযায়ী যাকাত প্রদানকালে উটের রশিও সঙ্গে নিতে অস্বীকার করলে শাস্তি প্রয়োগ করে তা আদায় করা হবে।" এরপর যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে খলিফা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে যাকাত আদায় করেন। এভাবে ইসলামের অন্যতম মূলনীতিকে রক্ষা করে বাইতুল মালকে সমৃদ্ধ করা হয়।

বহিরাক্রমণ প্রতিহত ও রাজ্য জয়

তিনি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করে ইসলামি রাজ্যের বিস্তৃতির সূচনা করে যান।

বাইজ্যন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ

রিদ্দা যুদ্ধের পূর্বেই রাসূল (স)-এর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে ৬৩২ সালে সিরিয়ার দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু উসামার প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে পুনরায় কলহের বেঁধে যায়। বাইজ্যন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম রাষ্ট্রের সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করেন। এদিকে বাইজ্যন্টাইন বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি ৬৩৩ সালে আমর ইবনুল আস, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, সুরাহবিল ইবনে হাসান ও আবু উবায়দার নেতৃত্বে চারটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। পারস্যের হীরাত হতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনীকে সিরিয়ায় পাঠানো হয়। বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরাসের পরিচালনাধীন দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী আজনাদাইন রণক্ষেত্রে মাত্র চল্লিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়।

পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান

মুসলিম সৈন্যবাহিনী যখন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে হীরাতের শাসনকর্তা কতিপয় আরব গোত্রকে মদীনা আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। আবু বকর (রা)-এ সময় মুসান্নার নেতৃত্বে ৮,০০০ মুজাহিদের একটি দল পারস্য সীমান্তে প্রেরণ করেন। ৬২১ খ্রি. আইলার যুদ্ধে ইরাকের শাসনকর্তা হরমুজ পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা হীরাত অধিকার করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ফোরাত নদীর তীরবর্তী আলবার, আইনুত তামুর এবং দুমায়া প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।

কুরআন সংকলন

মহানবীর (স) আমলে পবিত্র কুরআন লিখিত রূপ পায়নি। তখন তা সাধারণত হাফিজগণই মুখস্ত রাখতেন। কিন্তু হাফিযদের মৃত্যুর পর তা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত উমরের পরামর্শে অহী লেখক সাহাবী হযরত যায়িদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে কুরআনকে একত্রে পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ হযরত আবু বকরের (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি।

চারিত্রিক গুণাবলী

হযরত আবু বকর (রা) জন্মগত ভাবেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, সাধুতা, পবিত্রতা, দয়া, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণাবলী। অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও অতিথি পরায়ন ছিলেন তিনি। ভোগ বিলাস ও জাঁকজমক তাঁর নিকট ছিল অপছন্দনীয়। ইবাদত, ধার্মিকতা, খোদাভীতি ও পুণ্যের এক ফূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তিনি সারারাত নামাজ, ইবাদত বন্দেগী করে কাটাতেন। তিনি অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন। নামাজ, রোজা ও ইবাদতে তাঁর একাগ্রতা এবং প্রচণ্ড খোদা ভীতি ছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট ও ধর্মভীরু মুসলমান।

দানশীলতাও মহানুভবতা

আবু বকর ছিলেন দানশীল, নির্ভীক, দৃঢ়তা ও উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। তার সৌজন্য বোধ ও বিজয়ী ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করত। ইসলামের স্বেবায় তিনি তাঁর যথা র্সস্ব এমনকি নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে দ্বিধা করতেন না। বংশ মর্যাদা, ব্যক্তির উদারতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগেও আরবদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইসলামের কল্যাণের নিজের অর্থ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস হতেও তিনি অনুদার ছিলেন না।

চারিত্রিক দৃঢ়তা

পরিশ্রমী, বিপথে ধৈর্যশীলও বিচারে নিরপেক্ষ হযরত আবু বকর (রা) কোন দিনই কর্তব্যকার্যে পিছপা হননি। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীক তেজস্ক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, বিবি ফাতেমার দাবি না মঞ্জুরের মধ্যে। তিনি মহানবী (স) এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের ফিদাক নামক সম্পত্তিটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেন। তিনি প্রবল বিরোধিতার মুখেও ইসলামের মূল স্তম্ভ গুলি অপরিবর্তনীয় রাখেন। এতে তার দৃঢ় মনোবলও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

আড়ম্বরহীনতা

খলিফা আবু বকর (রা) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন থেকে এবং অতুল ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়েও তিনি নিতান্ত অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। খলিফা হয়েও তিনি বায়তুল মাল থেকে কোন প্রকার ভাতা নিতেন না। অবশ্য পরে হযরত ওমর (রা) ও আলী (রা)-এর অনুরোধে সৎসামান্য ভাতা গ্রহণ করলেও এতে তিনি স্বস্তি পেতেন না। মৃত্যু কালে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে রাজকোষ থেকে গৃহীত ভাতার সমুদয় অর্থ ফেরৎ দেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত আবু বকর (রা) বিভিন্ন মুখী অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে তিনি দু'বছর তিন মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এস্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা কঠোরভাবে দমন করে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন এবং নানা মুখী সমস্যা প্রতিকূলতা এবং ধ্বংসের হাত থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেন। তার অসামান্য কার্যাবলী বিবেচনা করে ঐতিহাসিকগণ তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আবু বকর (রা) ছিলেন রাসূলর বন্ধু। তিনি মহানবীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্ন নিতেন। তিনি মানবতার প্রতি দরদী ছিলেন। ধর্মপালনে তিনি ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৩

এক কথায় উত্তর দিন-

১. হযরত আবু বকর (রা) কে কেন ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয়?
২. হযরত আবু বকর (রা) কে কেন সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে?
৩. হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে কি বলেছিলেন?
৪. পবিত্র কুরআন সংকলন কোন খলিফার সময়ে হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা আবু বকরকে (রা) ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয় কেন?
২. খিলাফত লাভের পূর্বে আবু বকরের (রা) ইসলামের সেবা সম্পর্কে বলুন।
৩. হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ড নবী ও যাকাত বিরোধী আন্দোলন কিভাবে দমন করেন?
৪. পবিত্র কুরআন সংকলনে হযরত আবু বকরের (রা) ভূমিকা লিখুন।

পাঠ ৪ হযরত ওমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- হযরত ফারুক (র)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত লাভের বর্ণনা দিতে পারবেন।

পরিচয়

হযরত উমর ফারুক (রা) বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদিয়া গোত্রে ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম খাত্মা। তাঁর ডাক নাম ছিল আবু হাফস। তিনি ছিলেন শক্তিশালী বীরপুরুষ। কুস্তিগীর, সুবক্তা ও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে - 'জাহিলী যুগে কুরাইশ বংশের সতের জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।" তাঁর গোত্রের লোকেরা বিচার-আচার ও দূতের কাজে তাঁকে নিয়োগ করতেন। তাই তিনি এসব বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক যুবইয়ানী বলেন- "হযরত উমর একজন মস্তরড় পাহলোয়ান ছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। কাব্যে তাঁর ছিল অসাধারণ দখল। সে সময়ের অনেক কবির কবিতা তাঁর মুখস্ত ছিল।" তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি দেশ-বিদেশে গমন করেন। এ সুযোগে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের সাথে তাঁর মেলামেশা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের আগেই উন্নত ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানুষ হিসেবে আরবে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলাম তখনো শিশু, কুরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমানেরা যখন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ইসলামের চরম শত্রুদের অন্যতম হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম প্রাথমিক বিপর্যয় মুক্ত হয়।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ এক নাটকীয় ঘটনা। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তিনি খোলা তরবারি হাতে বের হয়েছিলেন। মাঝপথে জানতে পারলেন তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়েন। দ্রুত ভগ্নিপতির বাড়ি পৌঁছে তাদেরকে পেলেন কুরআন পাঠরত অবস্থায়। ঐ অবস্থায়ই বেদম প্রহার করে তাঁদেরকে তিনি কঠোর ভাষায় ইসলাম ত্যাগ করতে বললেন। প্রতি উত্তরে বোন বললেন– জীবন গেলেও আমরা ইসলাম ত্যাগ করব না। বোনের কথা ও কুরআনের মনোমুগ্ধকর সুরলহরীতে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। কি পড়ছিলেন তিনি তা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করায় "সূরা ত্বা-হার-এর-কয়েকটি আয়াত তাঁরা শোনান। এতে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। অতঃপর ভগ্নিপতি সাঈদকে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মহানবীর (স) নিকট উপস্থিত হয়ে মহানবী (স)-এর পদপ্রান্তে তরবারি রেখে কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। যে তরবারি নিয়ে আপনার শিরোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, আজ থেকে সে তরবারি ইসলামের শত্রু নিধনে ব্যবহৃত হবে।"

এভাবে নবুওয়াতের ৭ম বর্ষে ৩৩ বছর বয়সে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এ যাবত গোপনে ইসলামের প্রচারকার্য চলছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (র)- এর ওপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ এল। তিনিই সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রকাশ্যে সালাত আদায় ও ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ নেন।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরেই ইসলামের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হতে থাকে।

খিলাফত লাভ ঃ

হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়নি যাতে হযরত উমরের (রা) সক্রিয় সহযোগিতা ছিল না। তিনি সর্বদাই হযরত আবু বকরের (রা) পরামর্শদাতা রূপে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি সতত ইসলাম ও মুসলমানদের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

হযরত আবু বকর (রা) যখন জীবন সায়াহ্নে উপনীত হলেন তখন তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল খিলাফতের একটা মীমাংসা করে যাওয়া। যেন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয়। ইসলামি সমাজের ঐক্য যাতে অক্ষুণ্ন থাকে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আবু বকর (রা)-এর মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁর খিলাফতের এ গুরুভার হযরত উমর (রা) ব্যতীত আর কারো পক্ষে এই মুহূর্তে বহন করা সম্ভব নয়। তবুও হযরত আবু বকর (রা) তাঁর এ মনোভাবের পক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং উসমান (রা)-এর মতামত গ্রহণ করেন। তাঁরাও হযরত আবু বকর (রা)-এর মতের পক্ষে জোর মত দেন। তালহা (রা) একটু অমত করতে চাইলে আবু বকর (রা) তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তিনিও আর অমত করেননি। অতঃপর আবু বকর উসমান (রা)-কে ডেকে খিলাফতের সনদ লিখাতে আরম্ভ করেন। প্রাথমিক কয়েকটি কথা লিখার পর তিনি রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। তখন হযরত উসমান (রা) নিজ হতেই লিখে দেন- "আমি হযরত উমর (রা)-কে আমার পর খলিফা নির্বাচন করতে চাই। কিছুক্ষণ পর হুঁশ হলে তিনি হযরত উসমানকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি পর্যন্ত লেখা হল? হযরত উসমান (রা) পড়ে শুনালে তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এর প্রতিদান দিন।"

অঙ্গীকার পত্র সম্পাদিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পরিচারকের হাতে দিয়ে বললেন, সমবেত জনতাকে এটা পড়ে শুনিয়ে দাও। অতি কষ্টে তিনি নিজের গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হলেন এবং উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "ভাইসব, আমি আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে খলিফা নির্বাচন করিনি। বরং হযরত উমর (রা)-কে নির্বাচিত করেছি" যেন আপনারা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) হযরত উসমান (রা)-কে ডেকে কতকগুলো মূল্যবান উপদেশ দান করলেন।

হযরত উমর (রা) দায়িত্ব গ্রহণের পর অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ভাষণ নিম্নের দোয়া দ্বারা আরম্ভ করেন- "হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী করুন। হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র, আমাকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল করুন।" তারপর তিনি ঘোষণা করেন- "হে জনতা! যতদিন পর্যন্ত আপনারা রাসূলুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) বিরোধিতা করেছেন ততদিন আমি আপনাদের উপর কঠোর ছিলাম। এখন আমি আপনাদের ওয়ালী (অভিভাবক), আপনাদের ওপর কঠোরতা দেখাব না। কেবল জালিম ও অসৎ লোকদের প্রতি আমি কঠোর হবো। বলুন, আমি যদি নবীর (স) ও আবু বকরের (রা) খেলাপ কোন আদেশ দেই- তবে আপনারা কি করবেন? "তাঁর কঠোর স্বভাবের কথা ভেবে প্রথমে কোন লোক-এর কোন উত্তর দেয়নি। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। এবারে এক তরুন মুসলিম দাঁড়িয়ে তরবারী উঁচিয়ে বললেন- 'আমি এ তরবারি দিয়ে আপনাকে শায়েস্তা করব।' এ উত্তরে হযরত উমর (রা) খুবই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত উমর ছিলেন-
   ক. হাশেমী বংশের খ. কুরাইশ বংশের
   গ. উমাইয়া গোত্রের ঘ. বনু নাযীর গোত্রের।
২. হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহর চেয়ে ছোট ভাই ছিলেন-
   ক. ১০ বছরের খ. ১২ বছরের
   গ. ১৩ বছরের ঘ. ২৫ বছরের
৩. তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন-
   ক. নবুওয়াতের ৭ম বর্ষে খ. হিজরাতের পরে
   গ. নবুওয়াতের ১৩ তম বর্ষে ঘ. মক্কা বিজয়ের বছরে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উমর (রা)-এর পরিচয় দিন।
২. হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি লিখুন।
৩. হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দিন।
৪. হযরত উমর (রা)-এর খলিফা হিসেবে অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রথম ভাষণটি লিখুন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর বিজয় অভিযান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা) এর বিজয় অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন
- পারস্য বিজয়ের কারণ ও ঘটনাবলী উল্লেখ করতে পারবেন
- হযরত উমরের (রা) বাইজানটাইন রাজ্য বিজয়ের কারণ ও ঘটনাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন খলিফা হযরত উমর (রা)। খুলাফায়ে রাশেদার ক্রমতালিকায় তাঁর অবস্থান দ্বিতীয় হলেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ও যোগ্যতম খলিফা। তাঁর শাসনামলে মুসলমান সৈন্যরা বিশ্ব বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিল। একের পর এক বিজয় অভিযান চালিয়ে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের সীমারেখা বিস্তার করেন। তাঁর বিজয়াভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল-

পারস্য বিজয়

ইরাক-আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ইরান রাষ্ট্র নিয়ে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি। আরব মুসলমানরা বীরবিক্রমে বিশ্বের এ পরাশক্তিকে পদানত করে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন।

পারস্য বিজয়ের কারণ

হযরত উমরের (রা) শাসনামল শান্তিপূর্ণ হলেও কতিপয় কারণ পারস্য অভিযান অনিবার্য করে তোলে। যেমন–

ক. পারসিকদের ঈর্ষা ঃ মুসলমানদের উন্নতি, ইসলামের সমৃদ্ধি পারসিকগণ সহ্য করতে পারেনি। তাছাড়া পারসিকরা মুসলমানদের ধ্বংস সাধন করার জন্য সব সময় তৎপর ছিল।

খ. মুসলিম দূত হত্যা ঃ মহানবী (স) কর্তৃক প্রেরিত দূতকে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ অপমানজনক ভাবে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে হত্যা করে মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন।

গ. বিদ্রোহীদের সাহায্য দান ঃ রিদ্দা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে পারসিকগণ বিদ্রোহীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে এ সময় তারা ইসলামী শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার অপতৎপরতা চালায়।

ঘ. অর্থনৈতিক কারণ ঃ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী তীরবর্তী উর্বর ও সমৃদ্ধ দেশ ইরাকের সাথে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পারসিকগণ মুসলমানদেরকে তাদের দেশে বাণিজ্য করতে বাধা দিচ্ছিল।

ঙ. ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণ ঃ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পারস্যের ইরাক স্বাভাবিকভাবে আরবদের অংশ রূপে পরিগণিত হত। কিন্তু ইরাক সীমান্তে আরববাসীদের সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্য এ অঞ্চল মুসলমানদের দেশভুক্ত হওয়া জরুরী ছিল। এসব কারণে পারস্য অভিযান মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলী

সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য একবারে অধিকার করা সম্ভব হয়নি। একাধিকবার যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্যের সকল প্রদেশ মুসলমানদের দখলে এসে যায়। এ সব যুদ্ধসমূহের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ -

ক. ব্যাবিলনের যুদ্ধ ঃ খলিফা আবু বকরের (রা) খেলাফতকালে অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলের যুদ্ধ, আল ওয়ালাতাব যুদ্ধ এবং উলিসের যুদ্ধের পর সেনাপতি খালিদ সিরিয়ায় গমন করলে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ হরমুজের নেতৃত্বে ১০,০০০ পারসিক সৈন্যের এক বাহিনী সেনাপতি মুসান্নার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসান্না সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে প্রতি হামলা করলে পারসিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ৬৩৪ সালে অনুষ্ঠিত এ যুদ্ধ ব্যাবিলনের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

খ. নামারিকের যুদ্ধ ঃ কিংবদন্তীর যোদ্ধা রুস্তমকে পাঠানো হয় হীরাত পুনর্দখলের জন্য। মুসান্না তাঁর বাহিনী এবং ইতোমধ্যে খলিফা উমরের পাঠানো আবু ওবায়দার বিরাট বাহিনী নিয়ে নামারিক নামক স্থানে রুস্তমের মুখোমুখি হন। পারসিকরা এবারও পরাজিত হল। হীরাত মুসলমানদের দখলে থেকে যায়।

গ. জসরের যুদ্ধ ঃ (অক্টো ৬৩৪ খ্রি.) নামারিকের যুদ্ধের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য পারসিকরা সেনাপতি বাহমনের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। সেনাপতি আবু ওবায়দা মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে ইউফ্রেটিস নদীতে সাঁকো দিয়ে পার হয়ে পারসিকদের মুকাবিলা করেন। এজন্য একে সেতুর যুদ্ধ ও বলা হয়। কিন্তু পারসিকদের হস্তি বাহিনীর কারণে মুসলমানরা এ যুদ্ধে পরাজিত হলো। এ যুদ্ধে আবু ওবায়দাসহ প্রায় ৬ হাজার মুসলিম সেনা শাহাদাত বরণ করেন।

ঘ. বুয়ায়েবের যুদ্ধ ঃ সেতুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসান্নার সাহায্যে উমর (রা) বিপুল সৈন্য বাহিনী পাঠান। তারা কূফার নিকটবর্তী বুয়ায়েব নামক স্থানে পারসিকদের মুকাবিলা করেন। এ যুদ্ধে পারসিকরা চরমভাবে পরাজিত হয়। তাদের সেনাপতি মাহরানসহ বহু সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। এ যুদ্ধে জয়ের সুবাদে ইরাক মুসলমানদের দখলে আসে।

ঙ. কাদেসিয়ার যুদ্ধ ঃ (নভেম্বর ৬৩৫ খ্রি.) বুয়ায়েবে পরাজয়ের পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহাবীর রুস্তমের সেনাপতিত্বে একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রধান সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ত্রিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া প্রান্তরে তাঁবু ফেলে প্রথমে খলিফার নির্দেশ মত পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দকে দূত মারফত ইসলামের দাওয়াত দেন। সম্রাট দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। এরপর পারস্য বাহিনীকেও অনুরূপ দাওয়াত দেয়া হলে রুস্তমসহ অন্যান্যরাও তেমনি গর্বভরে তা প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিন দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে পারস্য সেনাপ্রধান রুস্তমসহ অনেকে নিহত হন। পারসিকরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এতে পারসিক শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে এবং মুসলমানরা ইরাকের বিশাল ভূ-খণ্ড দখল করে নেয়।

চ. মাদায়েন বিজয় ঃ (মার্চ ৬৩৭ খ্রি.) সেলুসিয়া ও টেসিকোন শহর অর্থাৎ মাদায়েন বিজয়ে অগ্রসর হয় মুসলিম বাহিনী। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় সহজেই অর্জিত হয়।

ছ. জালুলার যুদ্ধ ঃ (ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রিঃ) মাদায়েন হতে ১০০ মাইল দূরে হালওয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করে পারস্যরাজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় রণ প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সেনাপতি সাদ কা'কার নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্য তাদের মুকাবিলায় পাঠান হয়। জালুলা প্রান্তরে এ যুদ্ধ হল। পারসিকরা আবারও পরাজিত হল। এই যুদ্ধের মাধ্যমে হালওয়ান অধিকৃত হয়।

জ. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ঃ (৬৪১ খ্রি.) পারসিকদের সাথে এটা ছিলো চূড়ান্ত যুদ্ধ। জালুলার যুদ্ধের পর পারসিকরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে শান্তিপূর্ণ ভাবে দিন যাপন করছিল। কিন্তু আহওয়াজে সম্রাট হরমুজান বারবার সন্ধি ভঙ্গ করলে তাঁকে মদীনায় ধরে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে পারসিকদের এসব ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খলিফা মুসলমানদেরকে অনুমতি দিলেন।

ফিরোজানের নেতৃত্বে দেড়লাখ পারসিক বাহিনী আলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে সেনাপতি নুমানের নেতৃত্বে এ যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধকে চূড়ান্তকারী যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধের পর একে একে ফারস, কিরমান, মাকরান, সিস্তান, খোরাসান আজারবাইজান ইত্যাদিসহ সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল

মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও বিপুল ধন সম্পদের মালিক হয়। এই বিজয়ের পর পারসিকগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, পারস্য ছিল উন্নত সভ্যতার লীলাভূমি। পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানরা পারসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্মে আসে। পারসিক সভ্যতার প্রভাবে ইসলামী সংস্কৃতি সমৃদ্ধি অর্জন করে। তবে

এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সরল অনাড়ম্বর জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে। বিপুল ধন-সম্পদ প্রাপ্তির ফলে তারা বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করে যা তাদের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া পারসিক প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে মিয়া মতবাদেরও বিকাশ ঘটে।

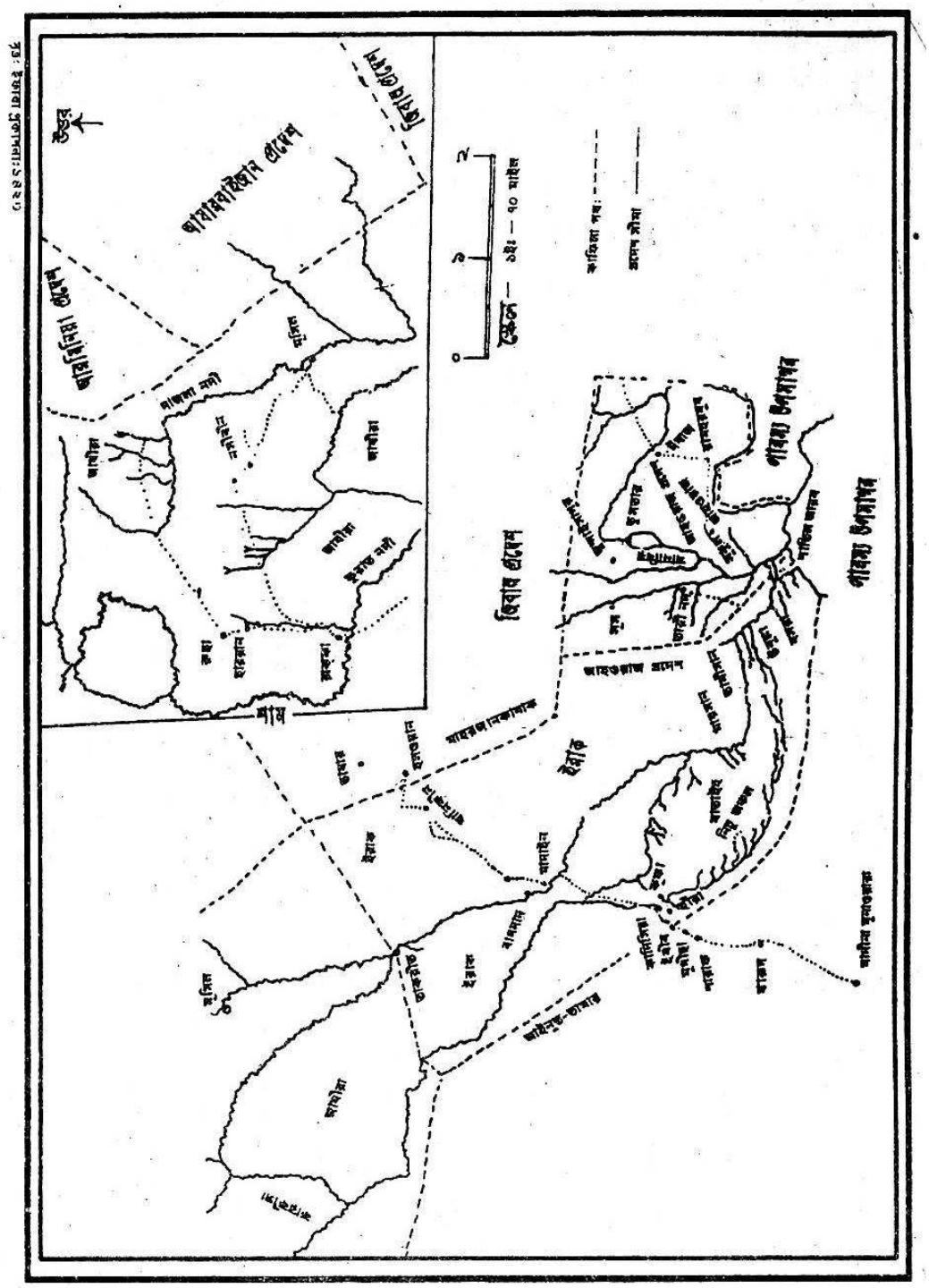

চিত্র-১৩ ঃ ইরাক ও পারস্যে মুসলিম সম্প্রসারণ

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বিজয়

সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন ও মিশরের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বাইজানটাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। রোমানরা এ সাম্রাজ্যের শাসক ছিল। প্রথমদিকে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে মহানবী (স)-এর সম্পর্ক ভাল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বাইজানটাইন বিজয়ের কারণসমূহ

১. মুসলিম দূত হত্যা ঃ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবদ্দশায় সিরিয়ায় প্রেরিত দূতকে মূতার খ্রিস্টান শাসক শুরাহবিল হত্যা করলে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২. অর্থনৈতিক কারণ ঃ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের উর্বর ভূমি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া তারা অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণে এ সাম্রাজ্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখে।

৩. ভৌগোলিক কারণ ঃ ভৌগোলিক দিক দিয়ে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন আরব সংলগ্ন থাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য মুসলমানগণ তা দখলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

৪. সীমান্ত সংঘর্ষ ঃ ইসলামের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে খ্রিস্টান বাইজানটাইন সাম্রাজ্য মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। বাইজান্টাইন শাসকগণ সিরিয়ার আরব বেদুঈনদেরকে আরব সীমান্তে হানা দিতে প্ররোচিত করে। তারা একদিকে ভণ্ডনবীদের সাহায্য করে আর অন্যদিকে সিরিয়া হতে আগত মুসলিম বণিকদের ওপর অকথ্য উৎপীড়ন করতে থাকে। তাছাড়া আরব সীমান্তের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো বারবার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করত। এ সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য বাধ্য হয়ে মুসলমানরা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য আক্রমণের পদক্ষেপ নেয়।

ঘটনা প্রবাহ

৬৩৪ সালের জুলাইয়ে সংঘটিত আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং ফিলিস্তিন ও সিরিয়া বিজয়ের সূচনা সংবাদ শুনে খলিফা আবু বকর (রা) মৃত্যুবরণ করেন। এর পর উমর (রা) ফিলিস্তিন বিজয়ের জন্য আমরকে সেখানে থাকার নির্দেশ দেন। অপর দিকে খালিদকে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করার জন্য অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন।

দামেস্ক বিজয় ঃ (অক্টোবর, ৬৩৫ খ্রি.) পরপর কয়েকবার পরাজিত হয়ে হিরাক্লিয়াস এন্টিওক শহরে আশ্রয় নেন, এ সময় খালিদ দামেস্ক অবরোধ করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় বাণিজ্য শহরটি ৬ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর এবং নগরবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ৬৩৫ সালের ১৩ অক্টোবর উক্ত নগরী মুসলমানদের দখলে আসে।

ফিহলের যুদ্ধ ঃ (নভেম্বর, ৬৩৫ খ্রি.) দামেস্ক নগরী উদ্ধারের জন্য আগত ব্যর্থ বাইজ্যন্টাইন সেনাবাহিনী জর্ডানে অবস্থান করছিল। আপোস মীমাংসার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ফিহলে রোমানদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৫০ হাজার সৈন্যের বাইজ্যন্টাইন বাহিনী পরাজিত হলে সমগ্র জর্ডান মুসলমানদের দখলে আসে।

হিমসের যুদ্ধ ঃ (৬৩৫ খ্রি.) জর্ডান দখলের পর সামান্য যুদ্ধের মাধ্যমে হিমস মুসলমানরা দখল করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ঃ দামেস্ক, মিসর ও জর্ডানের পতনে সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাগান্বিত হয়ে তার ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে দুই লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঠান। আবু ওবায়দা ও আমর এক বাহিনীসহ ইয়ারমুকে এসে পৌঁছেন। খালিদও জর্ডান হয়ে সেখানে উপস্থিত হন। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারের বেশি হল না। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট ইয়ারমুক প্রান্তরে উভয় দলের যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে বাইজ্যন্টাইন বাহিনী শেষ বারের মত চরমভাবে পরাজিত হয়। সেনাপতি থিওডোরাস নিহত হল। এ যুদ্ধে ঐতিহাসিকদের মতে ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বাইজান্টাইন সৈন্য নিহত হয়। অপর দিকে ৩০০০ মুসলিম সেনা শাহাদাত বরণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে যেমন পারস্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে, ঠিক তেমনি ইয়ারমুকের যুদ্ধও সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করে। এ বিপর্যয়ের পর হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মুসলিম বাহিনী সমগ্র সিরিয়া ও জর্দান দখল করেন। এরপর সহজেই কিন্নিসিরিন, এন্টিওক, আলেপ্পো, টায়ার, সিডন প্রভৃতি স্থান মুসলিম অধিকারে আসে। এভাবে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের পদানত হয়।

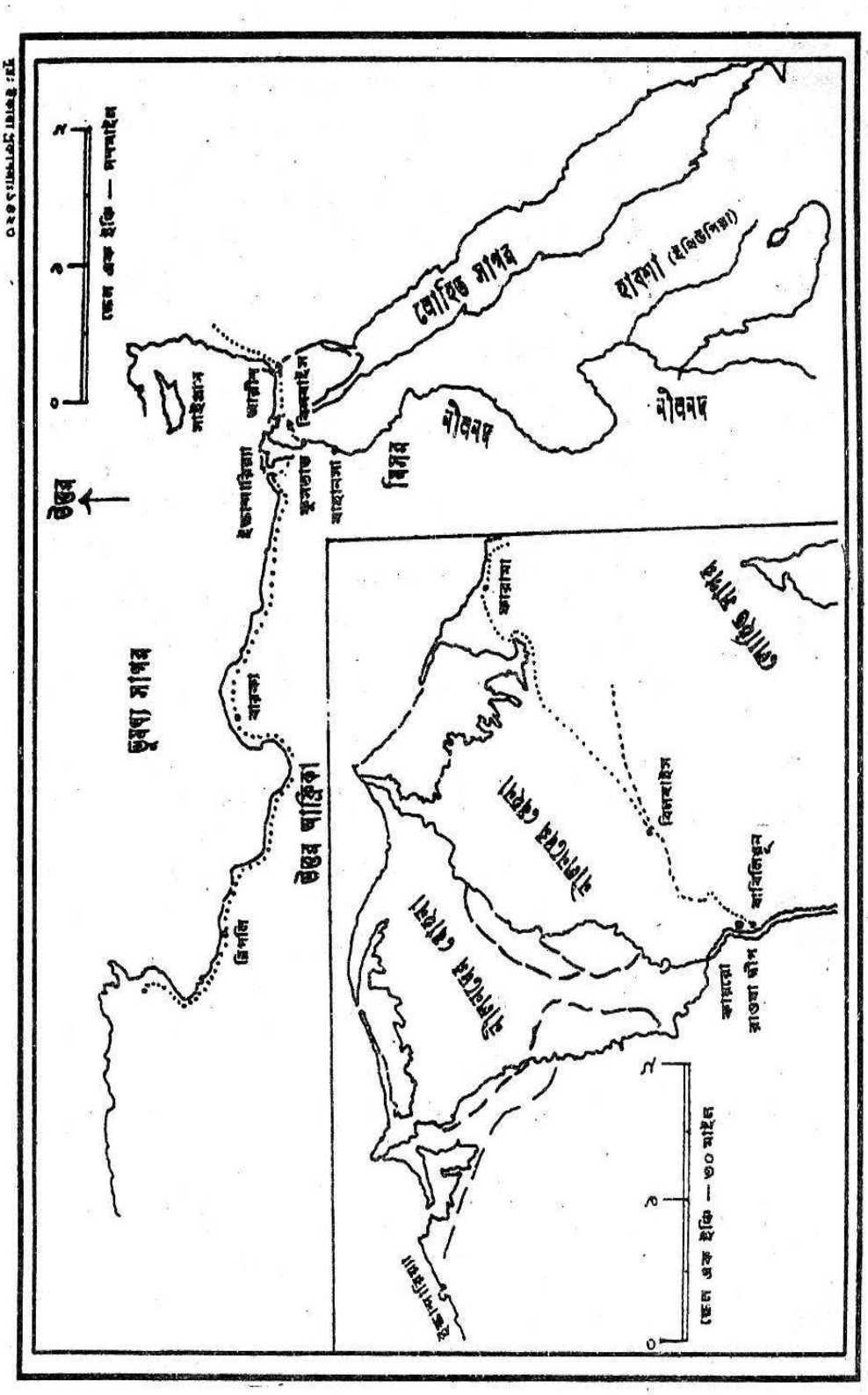

চিত্র- ১৪ ঃ সারায়ায় মুসালম সম্প্রসারণ

জেরুজালেম অধিকার ঃ (জানুয়ারি, ৬৩৭ খ্রি.) বাইজান্টাইন শাসনকর্তা আরতাযিমকে পরাজিত করে আমর ফিলিস্তিন দখল করেন। এরপর মুসলমান বাহিনী ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেম অবরোধ করেন। অল্পকাল অবরোধের পর জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতা খ্রিস্টান পাদ্রী সাফ্রীউনিয়াস খলিফা উমরের কাছে আত্মমর্পণ করে তাঁর হাতে শহরের চাবি অর্পণের প্রস্তাব করেন। সেনাপতি আবু ওবায়দা খলিফার কাছে এ সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়ে একজন ভৃত্য সহকারে উটের পিঠে হযরত ওমর (রা) জেরুজালেম আগমন করেন। খ্রিস্টানদের জানমাল, গীর্জা, বাসস্থানের নিরপত্তা দান করেন। খ্রিস্টানরা জিজিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে বিনা রক্তপাতে ১৬ হিজরির রজব মাসে উমর (রা) নগরীর চাবি গ্রহণ করেন।

জাজিয়া বিজয় ঃ জাজিয়াবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে মুসলমানরা তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এর পরও রোমানদের প্ররোচনায় আবার বিদ্রোহ করলে আবু ওবায়দা তাদের ৩০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে ৬৩৮ খ্রি. জাজিয়া দখল করেন।

আর্মেনিয়া ও সাইলিসিয়া দখল ঃ রোমানদের প্ররোচনায় কুর্দী ও আর্মেনিয়ানরাও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। উত্যক্ত হয়ে মুসলমানগণ কুর্দী অধ্যুষিত উত্তর মেসোপটেমিয়া ও আর্মেনিয়া দখল করেন। এরপর মুসলমানগণ এশিয়া মাইনরের রোমান শক্তিকেন্দ্র সাইলিসিয়া প্রদেশও অধিকার করেন।

এভাবে মাত্র সাত বছরের মধ্যে (৬৩৩-৪০ খ্রি.) সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে সেখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

মিসর বিজয় ঃ রাজনৈতিক দিক দিয়ে মিসর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সেখানকার শাসক ছিলেন মুকাওকাস। তিনি কিবতীদের পার্থিব ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন। ইসলামের উত্থানের আগে সেনাপতি আমর ইবনুল আস মিসর সফর করেন। তিনি ৬৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে পথিমধ্যে ফারমা, ওয়াদি আল-আরিশ, বিবলস এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট এলাকা দখল করে ফুসতাত দুর্গ অবরোধ করেন। এরপর খলিফা উমরের কাছে আরো ১০ হাজার সৈন্য চেয়ে পাঠান। খলিফা উমর ১০ হাজার সৈন্য পাঠালে দীর্ঘ সাত মাস দুর্গ অবরোধের পর বীর বিক্রমে তা দখল করে নেন। মুকাওকাস পরাজয় বরণ করেন।

এরপর আমর রোমানদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। রোমান সেনাপতি থিওডোরাসকে সহযোগিতা করতে সম্রাট সিজার্স ৫০ হাজার সৈন্য পাঠান। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড যুদ্ধে রোমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া পতনের সাথে সাথে রোমানদের শক্তি লোপ পায় এবং মিসর ইসলামী রাষ্ট্রের অংশে পরিগণিত হয়।

বার্কা ও ত্রিপলী জয়

মিশর জয়ের পর আমর পার্শ্ববর্তী বার্কা ও ত্রিপলী আক্রমণ করেন। মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে বার্ক আত্মমর্পন করে এবং করদ রাজ্যে পরিণত হয়। অতঃপর ত্রিপলীতে মুসলিম প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলাফল

বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্য জয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে মুসলমানগণ সিরিয়া, মিশর ও ফিলিস্তিনের মত তিনটি উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলের মালিক হয়। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। এ বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরের সংস্পর্শে আসে এবং তারা নৌশক্তির অধিকারী হয়। তাছাড়া গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় মুসলমানদের ইসলামী সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

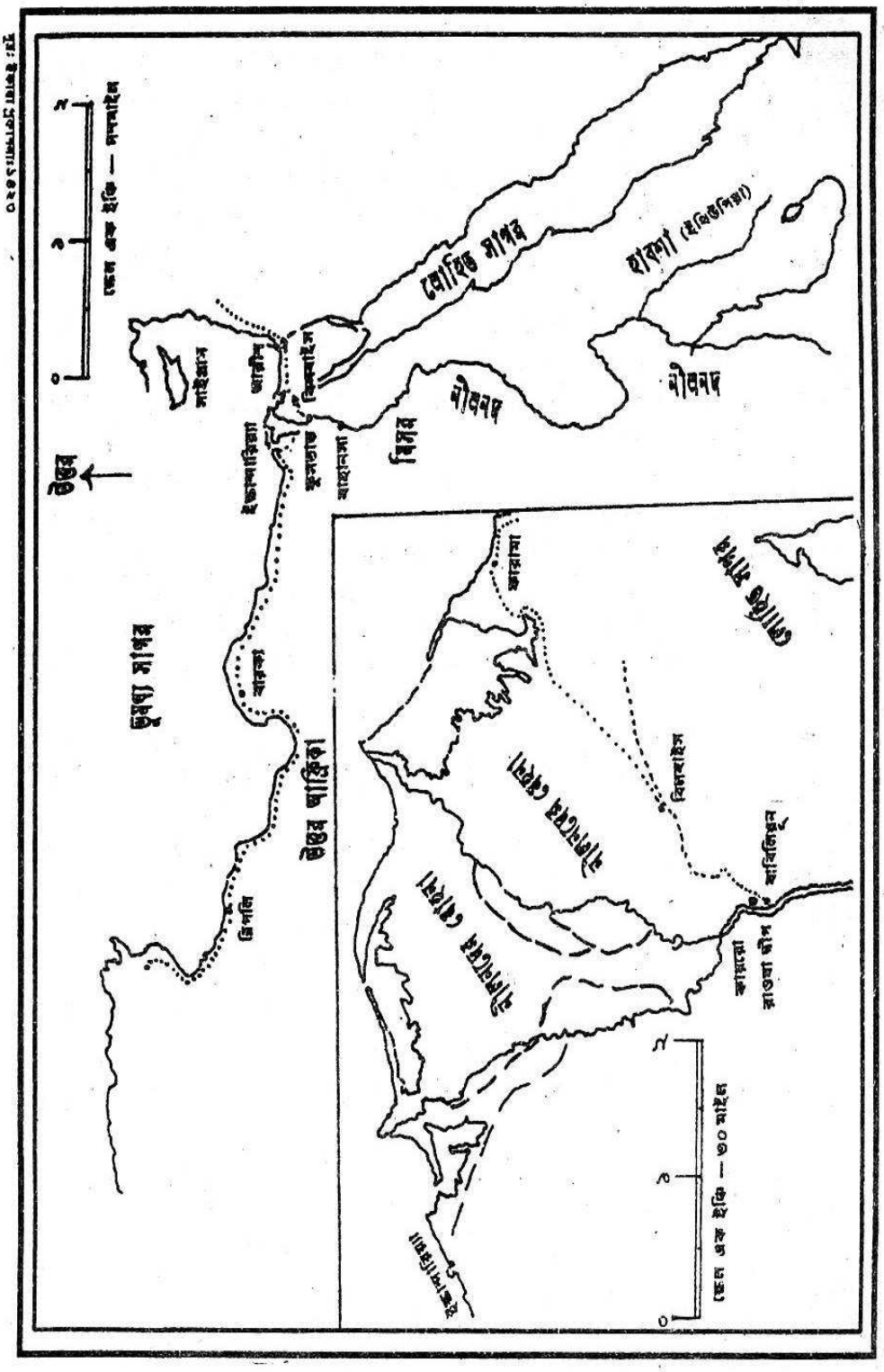

চিত্র-১৫ ঃ মিসরে মুসলিম সম্প্রসারণ

সার-সংক্ষেপ

হযরত উমর (রা)-এর শাসনামল ছিল ইসলামের সোনালি যুগ। তিনি ইসলামকে সারা দুনিয়াব্যাপী প্রতিষ্ঠার লক্ষে তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্যের বিপরীতে দুঃসাহসিক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আল্লাহর রহমত, মুসলিম বাহিনীর অনড় মনোবল ও যোগ্যতা সর্বোপরি হযরত উমর (রা)-এর যোগ্য তত্ত্বাবধানে মুসলিম বাহিনী প্রতিটি যুদ্ধে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৫

এক কথায় উত্তর দিনঃ

১. পারস্য সাম্রাজ্য বলতে আপনি কি বোঝেন?
২. ব্যাবিলনের যুদ্ধে কে কার বিরুদ্ধে কত সৈন্য নিয়ে কোন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন?
৩. কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
৪. বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝেন?
৫. কোন সময়ে কোন খ্রিস্টান শাসক মুসলিম দূতকে হত্যা করেন?
৬. কোন যুদ্ধে রোমান বাহিনী শেষ বারের মত চরমভাবে পরাজিত হয় এবং ঐ যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
৭. জেরুজালেম কিভাবে মুসলিম অধিকারে আসে?
৮. জাজিরা বিজয় কিভাবে হয়?
৯. কোন সময়ে মিসর মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পারস্য সাম্রাজ্যের পরিচয় দিন এবং মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের কারণগুলো উল্লেখ করুন।
২. ব্যাবিলনের যুদ্ধ ও কাদেসিয়ার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করুন।
৩. নিহাত্তায়ান্দের যুদ্ধের বিবরণ দিন।
৪. বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পরিচয় দিন এবং বাইজানটাইন অভিযানের কারণসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
৫. ইয়ারমুকের যুদ্ধ ও জেরুজালেম অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৬. মিসর বিজয়ের বিবরণ উল্লেখ করুন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসন নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (র)-এর শাসন নীতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- শাসন তান্ত্রিক সংস্কারসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- শাসনতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় আয় এবং অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রা) খিলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্ব ইতিহাসে তাঁর শাসন ব্যবস্থা একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি সুবিশাল সাম্রাজ্য জয় করার সাথে সাথে একটি সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট-শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যার কারণে ইতিহাস তাঁকে 'মহান উমর' (বটর্দণ ঐরণর্ট) বলে আখ্যায়িত করেছে। এখানে তাঁর শাসন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা হল ঃ

১. ইসলামি শাসন পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঃ হযরত উমর (রা)-এর সময়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। তাঁর খিলাফত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্য হযরত উমর (রা) ইসলামের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। রাসূলে করীমের মদীনা প্রজাতন্ত্র প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ফারুকের সময় সম্প্রসারিত হয়ে একটি বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হলে শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করতে হয়।

২. গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ হযরত উমর (রা) ইসলামের মূলনীতি এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ইসলামী শাসন প্রণালী রচনা করেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই আইনের চোখে সমান এবং নাগরিক অধিকার ভোগ-ব্যবহার করার সমানাধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে এবং তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে খলিফা সেই মত ইসলামী আদর্শের শাসন নীতি প্রবর্তন করেন। এক নায়কত্বের পরিবর্তে গণতন্ত্র, নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্তি, পরামর্শ সভার মতানুসারে প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রম গ্রহণ, সাম্য, একতা, ভ্রাতৃত্বের আদর্শে জনকল্যাণকর নীতি চালু, খলিফার কাজে জনগণের সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সরকারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত উমরের (রা) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপর মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন, ৎখভঢণর বটর্দণ যরধভডধযফণ মত ঢণবমডরটডহ ষট্র ডটররধণঢর্ম ট যমধর্ভর্ম ষদধডদ র্ধ ষধফফ হর্ণ টপণর্দণ ষমরফঢর্ধবণর্ম র্টটধভ.ঃ অর্থাৎ, হযরত উমরের সময় গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর বহন করা হয়েছিল তা অর্জন করতে বিশ্বের আরও সময় লাগত।"

৩. পরামর্শ-সভা ঃ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হযরত উমর মজলিস-ই-শুরা নামে মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন। মজলিসে শুরার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি রাজ্য শাসন করতেন। মজলিস-ই-শুরা ছাড়াও তাঁর দুটি মজলিস ছিল-

ক. মজলিস-ই-আম বা সাধারণ পরিষদ;

খ. মজলিস-ই-খাস বা বিশেষ পরিষদ।

'মজলিসে আম'- এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। আর মজলিস-ই-খাস দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করত।

"পরামর্শ ছাড়া খিলাফত তথা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না"-এ বক্তব্য ছিল তাঁর। খলিফা কখনই নিজের মতে কোন কাজ করতেন না। এতে প্রমাণিত হয় তিনি পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। মদীনায় মসজিদে পরামর্শ সভা বসত। সৈন্য, ও কর্মচারী, শাসনকর্তা, বিচারক নিয়োগ বদলি, যুদ্ধ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং রাষ্ট্রের খুটিনাটি ব্যাপারেও খলিফা সব সময় মজলিসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

৪. শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে ঃ

ক. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ঃ হযরত উমর (রা) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক হন খলিফা স্বয়ং। তিনি বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদে যোগ্যতম সাহাবীদের নিয়োগ করে সাম্য ও ন্যায়-নীতিভিত্তিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. প্রশাসনিক বিভাগ ঃ শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য হযরত উমর (রা) সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। প্রদেশের শাসনকর্তার উপাধি ছিল আমীর এবং জেলার শাসক ছিলেন ওয়ালী বা নায়েব। জেলার শাসক প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা সরাসরি খলিফার কাছে দায়ী থাকতেন।

গ. কর্মকমিশন ঃ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে কর্মচারী নিয়োগ করার জন্য তিনি কর্মকমিশন গঠন করেন। আর উচ্চ পদসমূহে লোক নিয়োগ করতেন মজলিসে শুরার পরামর্শে খলিফা স্বয়ং।

ঘ. গোয়েন্দা বিভাগ ঃ তিনি সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে অবগতি, কর্মচারীগণের দায়দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা জানানোর জন্য গোয়েন্দা ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিলেন।

ঙ. তদন্ত বিভাগ ঃ সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য হযরত উমর (রা) তদন্ত বিভাগ সৃষ্টি করেন।

চ. পুলিশ বিভাগ ঃ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফা উমর (রা) সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া নগর রক্ষী দল এবং নৈশ পাহারার জন্য একটি আলাদা বাহিনী গঠন করেন।

ছ. জেলখানা প্রতিষ্ঠা ঃ খলিফা উমর (রা) সর্বপ্রথম মক্কা শরীফের অপরাধীদের সংশোধনের জন্য জেলখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ই সর্বপ্রথম নির্বাসন দণ্ড চালু হয়।

৫. বিচার ব্যবস্থা

ক. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত করে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিভাগ স্থাপন করা হযরত উমরের একটি অভিনব কীর্তি। প্রত্যেক প্রদেশে বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করেছিলেন, কাযীর অধীনে বিভিন্ন শহরে বিচারক নিযুক্ত হতেন। সকলেই সমান বিচার পেতেন। এভাবে আইনের দৃষ্টিতে সমতা স্থাপন করা হয়।

মুসলিম আইনের বাইরে অমুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আইন-কানুনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন।

খ. ফাতাওয়া বিভাগ ঃ জনগণকে ইসলামী আইন-কানুন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করার জন্য খলিফা উমর (রা) ফাতাওয়া বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. রাষ্ট্রীয় আয়

ক. রাজস্ব বিভাগ ঃ রাজস্ব বিভাগেও খলিফা উমর (রা) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির জন্য এ বিভাগ কাজ করত। যাকাত, খারাজ, জিযিয়া, গণীমাত, ফাই ও উশর ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস।

খ. বাইতুল মাল ঃ সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজস্ব সংগৃহীত হয়ে বাইতুল মাল নামে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হত। এটা ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব প্রতিষ্ঠান, জনগণের সম্পত্তি। এখান থেকেই প্রজা ও কর্মচারীদের কল্যাণে অর্থ ব্যয় হত।

৭. ভূমি সংস্কার ঃ হযরত উমর (রা) সারা দেশের ভূমি জরিপ করে চাষযোগ্য ভূমির সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভূমির সুষ্ঠু বণ্টন ও মালিকানা নির্ধারণ করে দেন। এতে কৃষি ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়।

৮. আদমশুমারি ঃ হযরত উমর সাম্রাজ্যের লোকদের আদমশুমারি করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হযরত উমরের আদমশুমারি পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন খাতে খরচ করার পর যে অর্থ থাকত তা দুঃস্থ লোকজন ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এরজন্যও আদমশুমারি করা হয়। ঐতিহাসিক মুইর বলেন- "উমরের প্রবর্তিত ভাতা ভোগকারীদের বৃত্তি-তালিকা সম্ভবত দুনিয়ার বুকে তুলনাবিহীন ছিল।"

৯. কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ ঃ কৃষি কার্যের ব্যাঘাত ঘটবে এবং সেনাবাহিনী সামরিক দক্ষতা হারাবে এ যুক্তিতে তিনি জায়গীর প্রথা বাতিল করেন। বিজিত অঞ্চলের জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। কৃষির উন্নয়ন, জমির উপযুক্ত ব্যবহার, পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করে কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন। সেচের জন্য খাল খনন ও সরকারি সহায়তা দান করে কৃষি কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য হযরত উমর অগ্রিম কৃষিঋণ দেয়ার প্রথা চালু করেন। কৃষকের ওপর করের বোঝা কমিয়ে দেন। বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করার জন্য আমদানি-রপ্তানি কর লাঘব করে দেন। তিনি বাঁধ-সংস্কার ও খাল খনন করে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করেন।

১০. জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ঃ জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের কল্যাণই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। সমাজের অক্ষমদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, আবাদ, সেচ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ খাল, সেতু, দুর্গ, হাসপাতাল, অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এসব কাজে তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১২. দাস প্রথার বিলোপ ঃ ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ আলী বলেন ঃ "দাসত্ব প্রথা বিলোপে গৃহীত পদক্ষেপ হযরত উমরের কৃতিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল।"

১৩. হিজরি সনের প্রবর্তন ঃ হযরত উমর (রা) সর্বপ্রথম হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

১৪. ইসলামের প্রসার-প্রচার ঃ হযরত উমর (রা) অধিকৃত দেশসমূহে এবং জনসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামী বিশ্বের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর খিলাফত আমলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ও শাসন প্রণালী সর্বাঙ্গীনভাবে পূর্ণতা লাভ করে এবং পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। আমীর আলীর ভাষায়- "ত্রিশ বছরের খিলাফত আমলে উমরের (রা) প্রণীত নীতিমালাই তাঁর জীবনে এমনকি তাঁর পরেও বলবৎ থাকে।" সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হযরত উমর (রা)-ই প্রকৃতপক্ষে ইসলামি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রূপকার এবং আদর্শ শাসক ও সর্বোত্তম কৃতিমান পুরুষ ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৬

এক কথায় উত্তর দিন ঃ

১. দ্বিতীয় খলিফা হয় উমর (রা) কে কেন "মহান উমর" বলা হয়ে থাকে?
২. হযরত উমর (রা) কেন ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?
৩. হযরত উমরের (রা) পরামর্শ সভার ধরণ কেমন ছিল?
৪. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ-সমূহে লোক নিয়োগ করায় হযরত উমরের নিয়ম কি ছিল?
৫. সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি কোন সময়ে হয়েছিল?
৬. হিজরি সনের প্রর্বতন কে কোন সময় থেকে করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দ্বিতীয় খলিফা উমরের অবদান মূল্যায়ন করুন।
২. হযরত উমরের (রা) মজলিসে শূরা কেমন ছিল?
৩. হযরত উমরের (রা) শসন সংস্কারের পদক্ষেপ গুলো কি কি?
৪. হযরত উমরের (রা) বিচার বিভাগ সম্পর্কে ধারণা দিন।
৫. হযরত উমরের জনকল্যাণমূলক পাঁচটি কাজের উল্লেখ করুন।

হযরত উমর (রা)-এর চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা) এর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- হযরত উমরের চারিত্রিক গুণাবলীর বিভিন্ন দিকের বিবরণ দিতে পারবেন।

হযরত উমর (রা) ইসলামি জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার, ধার্মিক, সরলতা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার উত্তম দৃষ্টান্ত ইত্যাদির সংমিশ্রণই তাঁর জীবনালেখ্য। এই সমস্ত গুণে বিভূষিত ছিলেন বলেই মহানবী (স) তাঁকে আগাম বেহেশতের সংবাদ প্রদান করেছিলেন।

সহজ-সরল জীবনযাত্রা

আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর (রা)-এর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বর। বিনয় ও নম্রতার সাথে সারারাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। জাগতিক লোভ-লালসা, জাঁক-জমক, তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভাল খাবার ও ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ তিনি পছন্দ করতেন না। তালি দেওয়া, ছেঁড়া জামা ও ছেঁড়া জুতা সেলাই করে পরতেন। বিদেশী দূতদের সাথে তিনি সাধারণত অনাড়ম্বর অবস্থায় এমনকি তালি দেওয়া জুতা পরিধান করেও সাক্ষাত করতেন। কথিত আছে যে, পারস্য যোদ্ধা হরমুজ বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হলে খলিফাকে মসজিদের মেঝেতে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। জেরুজালেমের পথে প্রভু তৃত্য পালা করে উষ্ট্রে আরোহণ করেন। আর পালা মত জেরুযালেমের দ্বারে ছিন্নবস্ত্রে উটের লাগাম হাতে খলিফাকে দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন। খলিফা তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে একজন বেদুঈন মহিলার প্রসবকালীন পরিচর্যার জন্য পাঠান। এ রকম অসংখ্য ছিল তাঁর সারল্য ও উদারতার উদাহরণ।

জনসেবা

দুঃখীদের দুর্দশায় তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠত। এজন্য তিনি মদীনা শহর ও শহরতলীতে গভীর রাতে বের হয়ে তাঁর রাজ্যে কোন দুঃখী আছে কিনা তা পরিদর্শন করতেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের কাঁধে করে খাদ্য-সামগ্রী বহন করে দীন-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টন করতেন। নিজে অনেক সময় উপোস করতেন, তবুও বায়তুল মাল হতে কিছু গ্রহণ করতেন না। মৃত্যুর পূর্বে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ছিয়াশি হাজার দিরহাম তাঁর ঋণ ছিল; কিন্তু তবুও বায়তুল মাল হতে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেননি। তাঁর ভদ্রতা ও নম্রতার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি বিধবা স্ত্রীলোকদের জন্য নিজে কাঁধে করে পানি পৌঁছায়ে দিতেন এবং মুজাহিদদের স্ত্রীলোকদের জন্য বাজার করে সওদা পৌঁছে দিতেন। এমনি অবস্থায় তিনি ক্লান্ত হয়ে মসজিদের এক কোণে মাটিতে শুয়ে থাকতেন।

সম্পদের প্রতি অনীহা

ধন-সম্পদের প্রতি হযরত উমর (রা)-এর ছিল তীব্র অনীহা। জাঁক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। বিলাসিতা মানব জীবনের সরলতা ও পবিত্রতা বিনষ্ট করে। মাদাইন ও জালুলার যুদ্ধের মালে গণীমত তাঁর নিকট প্রেরিত হলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে, এ সমস্ত ধন-সম্পদই মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী উমাইয়া শাসনামলেই প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামী বিধি-বিধানের একনিষ্ঠ সেবক

হযরত উমর (রা) খিলাফতের মূল আদর্শ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ ও সংরক্ষণ করতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "হযরত উমর (রা)-এর জীবন চরিত রচনার জন্য অল্প কথা প্রয়োজন- সরলতা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ, ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শাসনের মূলনীতি।"

ন্যায়-বিচারক

হযরত উমর (রা) ছিলেন সঠিক অর্থেই ন্যায় বিচারক। বিচার বিভাগকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য বিত্তবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি বিচারক নিযুক্ত করেন। খলিফা উমর (রা)-এর ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের খ্যাতি সর্বকালের

সর্বযুগের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, উবাই ইবনে কা'ব একবার খলিফার বিরুদ্ধে বিচারপতি যায়েদ ইবনে সাবিত এর নিকট অভিযোগ করেন। খলিফা আদালতে উপস্থিত হলে যায়েদ ইবনে সাবিত নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়ে খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং কুরআন স্পর্শ করে শপথবাণী উচ্চারণ থেকে খলিফাকে বিরত রাখলেন। এতে খলিফা অসন্তুষ্ট হলেন এবং যায়েদকে বিচারকের পদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। বীরশ্রেষ্ঠ খালিদকে নিরপেক্ষ বিচারে তাঁর সম্পত্তির কৈফিয়ত প্রদানের জন্য খলিফা নির্দেশ দেন। খালিদ অমান্য করলে তাঁকে পদচ্যুত করেন। মদ্যপানের জন্য খলিফা নিজ পুত্র আবু সামাহকে ৮০ বার বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। তিনি খ্রিস্টান নাগরিক জাবানাকে ভৃত্যের সাথে কঠোর আচরণের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। কথিত আছে, "উমর (রা)-এর চাবুক অন্যের তলোয়ার হতেও বেশি ভয়ঙ্কর ছিল।"

জগত এবং জীবন সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান, মানব চরিত সম্বন্ধে অপূর্ব দক্ষতা খলিফা উমরকে যশস্বী করে তুলেছিল। পক্ষপাতহীনতা ও প্রজানুরাগ ছিল তাঁর শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীন-দুঃখীর সেবায় ছিল তাঁর আনন্দ।

গণতান্ত্রিক স্পৃহা

ইসলামী গণতন্ত্রের বীজ প্রথম উপ্ত হয় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর সময়কালেই তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। তাঁর বলিষ্ঠ শাসননীতি সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শে সুন্দর ও স্বার্থক হয়ে উঠেছিল।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উমর (রা)-এর মত বহুমুখীগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মানুরাগ, কোমলতা ও সংযমে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সার্থক প্রতিচ্ছবি। ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, তাঁর মধ্যে আলেকজান্ডারের সাহস ও বীরত্ব, এরিস্টটলের সাংগঠনিক দক্ষতা, তৈমুর লংঙের কঠোরতা, বুদ্ধদেবের কোমলতা, নওশেরওয়ানের ন্যায়পরায়ণতা, ইব্রাহীমের ধর্মপরায়ণতা এবং আবু হানীফার শিক্ষা ও প্রজ্ঞা প্রভৃতিগুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রা) বলেন, "হযরত উমর (রা) মোটামুটি এক হাজার মুসলিম আইন ও ব্যবহারতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্নের উপর মতামত ও বিশ্লেষণ পেশ করেন। এতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করা হয়।" ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কিংবদন্তীতে প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে রাসুলুল্লাহ (স)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়।" প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রা) ছিলেন তাঁর পরবর্তী যুগ ও শতাব্দীসমূহের জন্য আদর্শ খলিফা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৭

অল্প কথায় উত্তন দিন

১. হযরত উমরের (রা) জীবন যাত্রা কেমন ছিল?
২. হযরত উমর (রা) গভীর রাতে শহরে ঘুরে বেড়াতেন কেন?
৩. ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে হযরত উমরের (রা) দুই / একটি ঘটনার উল্লেখ করুন।
৪. হযরত উমরের ব্যাপার বহুগুণের অধিকারী হিসেবে ঐতিহাসিকদের অভিমতটি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উমর (রা)-এর জীবনযাত্রা কেমন ছিল? তার একটি বিবরণ দিন।
২. 'জনসেবায়' হযরত উমরের (রা) ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকটি বিবরণ ঘটনার উল্লেখ করুন।
৩. "হযরত উমর (রা) ছিলেন সঠিক অর্থে ন্যায় বিচারক।" বিশ্লেষণ করুন।

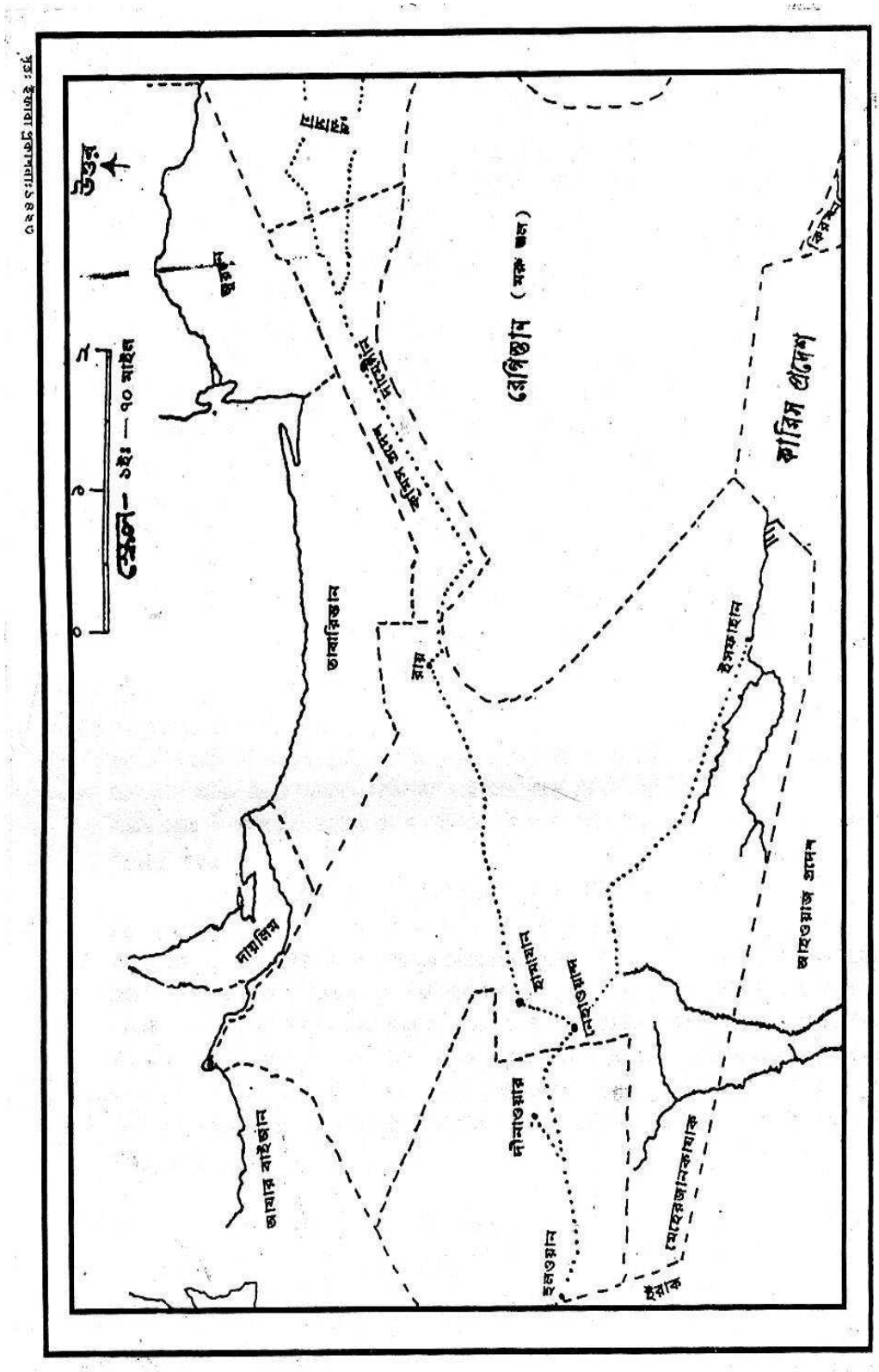

চিত্র-১৬ ঃ হযরত উমর (রা)-এর সময়ে পারস্যে মুসলিম অভিযান

পাঠ ৮ হযরত ওসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমানের (রা) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- হযরত উসমানের (রা) খিলাফত লাভের সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- ইসলামের খিদমতে হযরত উসমানের (রা) অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন

প্রাথমিক জীবন

খুলাফয়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। তিনি কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে ৫৭৩ (মতান্তরে ৫৭৫) খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। উসমানের পারিবারিক নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও আবু উমর। হযরত উসমান (রা) ছোটবেলায়ই লেখাপড়া শেখেন। কিশোর বয়সে কাপড়ের ব্যবসায় শুরু করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তিনি খুবই উন্নতি করেছিলেন। এমনকি তিনি সে সময়ের সেরা ধনী ছিলেন, এজন্য তাঁকে সবাই 'উসমান গনী' (ধনী) বলে ডাকতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই নম্র ও সৎ চরিত্রবান ছিলেন। ভদ্র, মার্জিত রুচি, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর জন্য সকলের নিকট তাঁর খ্যাতি ছিল। দান-খয়রাত ও বদান্যতায় তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর।

ইসলাম গ্রহণ

রাসূলে করীম (স) যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছর। এক রাতে উসমান (রা) স্বপ্নে যেন কারো আদেশ শুনতে পেলেন। 'জেগে ওঠ, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।' এ বাণী শ্রবণে তাঁর অন্তর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি দ্রুত রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা ছিলেন ইসলামের ঘোর দুশমন, এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেন, বেঁধে মার-ধর করে কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের কোন নড়-চড় হয়নি।

শাহ্ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদভী বর্ণনা করেন, "হযরত উসমান (রা)-এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসূলে করীম (স) আবির্ভূত হন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে উসমান (রা)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। সিদ্দীক (রা)-এর দাওয়াতে তাঁর মন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুন্নুরাইন উপাধি লাভ

হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু কন্যার পাণি গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর মেয়ে রুকাইয়াকে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট বিবাহ দেন; কিন্তু তিনি মারা গেলে উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসূমকে বিবাহ করেন বলে তাঁকে 'যুন-নুরাইন বা দুটি রশ্মির অধিকারী খেতাব প্রদান করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স) উসমান (রা)-কে এত ভালবাসতেন যে, দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করলে নবী করিম (স) বলেন যে, "আমার যদি অন্য একটি কন্যা থাকত, তাহলে আমি তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।"

খিলাফত লাভের পূর্বে উসমান (রাঃ)-এর অবদান

আবিসিনিয়ায় হিজরত

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগল, কাফিরগণ শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিরোধিতা শুরু করল। চাচা হাকাম হযরত উসমান (রা) কে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল, সম্মানিত বন্ধু-বান্ধব সকলেই ঘৃণা করতে লাগল।

যখন শাস্তির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন রাসূল (স) উসমান (রা)-কে তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। হযরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করে ইসলামে প্রথম হিজরতকারীর সম্মানে ভূষিত হলেন। তখন ছিল নবুয়তের পঞ্চম বছর। আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থানের পর কোরাইশদের মিথ্যা খবরে মক্কার অবস্থা সুস্থ মনে করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন; কিন্তু এসে

ভুল বুঝতে পারলেন। অন্যান্য সাহাবী পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান; কিন্তু হযরত উসমান (রা) মক্কায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে মদীনায় হিজরত কালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশে মদীনা চলে যান।

ওহী লেখক

প্রথমে হযরত উসমান (রা) ছিলেন অহী লেখক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় অহী লেখার দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি অহীলেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

কূপ ক্রয়, মসজিদ সম্প্রসারণ

মোহাজেরীন যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন সেখানে পানির খুব অভাব ছিল। সারা শহরে মাত্র 'বীরে রুমা' নামে এক ইহুদির পানযোগ্য একটি কূপ ছিল। সে এটাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছিল। মোহাজেরীনদেরও এতদূর ক্ষমতা ছিল না যে, পানি ক্রয় করে পান করবে। হযরত উসমান ১৮ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। সে সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল। হযরত উসমান (রা) অনেক উচ্চমূল্যে এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করলেন এবং সে অংশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদরের যুদ্ধের সময় যেহেতু স্ত্রী রুকাইয়া (রা) মারাত্মক রোগাক্রান্ত ছিলেন, তাঁর সেবা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত উসমানকে মদীনা রেখে যান, কিন্তু তাঁকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং গনীমতের অংশও দেওয়া হয়। এভাবে জাতুর রেকার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান, তাই তিনি সেই যুদ্ধেও অংশ নিতে পারেননি, এছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূল (স) এর নির্দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন।

যুদ্ধ তহবিলে দান

হযরত উসমান (রা) ছিলেন অত্যন্ত সম্পদশালী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তাঁর এ প্রাচুর্যের কারণে সকলে তাঁকে 'গনী' বা ধনী নামে অভিহিত করত। তিনি তাঁর অর্থ-সম্পদকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে গেছেন, আরবের সকলে তাঁকে দানশীল হিসেবে জানত। তাবুকের যুদ্ধে তিনি দশ হাজার সৈন্যের খরচ বহন করেন। এছাড়া এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া, এক হাজার দীনার রাসূলুল্লাহর (স)-এর দরবারে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) খুশি হয়ে বলেন, 'আজকের পরে উসমান যদি এ জাতীয় কোন ভাল কাজ নাও করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই'।

খলিফা নির্বাচন

হযরত উমর (রা)-এর অন্তিমকাল যখন ঘনিয়ে এল, তখন ইসলামি খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আবু ওবায়দা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়ত তাঁকেই মনোনীত করা হত; কিন্তু তিনি ইত:পূর্বে পরলোক গমন করেছেন। আব্দুর রহমান (রা) অশেষ শ্রদ্ধাভাজন থাকলেও তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হযরত উসমান, আলী, তালহা এবং সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে যে কোন একজনের উপর এ প্রকার কর্তব্যভার অর্পণ করা যেত। হযরত উসমান (রা)-এর বয়স ছিল তখন ৭০ বছর। ইসলামের জন্য আর্থিক দান তাঁকে প্রভূত গৌরব দান করেছিল।

হযরতের জামাতা ও চাচাত ভাই আলী ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যাবত্তা এবং ধর্মজ্ঞানের জন্য তিনি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু ছিলেন। তিনি প্রথিতযশা পণ্ডিতও ছিলেন। ইসলামের জন্য তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর দানও ছিল অসামান্য। পারস্য বিজয়ী সাদ ও (রা) একজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। এরূপে দেখা যায় যে, ইসলামের খেদমতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের অবদান প্রণিধানযোগ্য। সার্বিক বিবেচনায় এদের কেউ কারো অপেক্ষায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদের মধ্য থেকে কোন একজন দায়িত্ব দেয়া খলিফার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেয়াটাও ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

যখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল, তখন হযরত উমর (রা) খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি উসমান, আলী, যুবায়ের, তালহা, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমানকে নিয়ে এক নির্বাচনী পরিষদের ওপর ন্যস্ত করলেন। তাঁদের হযরত উমরের মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে মনোনয়ন কার্য সমাধা করতে নির্দেশ দেয়া হল।

খলিফা উমর (রা)-এর মৃত্যুর পর নির্বাচনী পরিষদের পাঁচ জন সভ্য রাজধানী মদীনাতে উপস্থিত থেকে নির্বাচনী প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল তখন এই অপ্রীতিকর ও সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য আব্দুর রহমান খিলাফতের দাবি ত্যাগ করলেন। আলী (রা) ব্যতীত নির্বাচনী পরিষদের অন্যান্য সকল সভ্যই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে লাগলেন। আলী (রা) বললেন যে, তিনি আত্মীয়-স্বজন কারো কথার মূল্য না দিয়ে কেবলমাত্র অধিকার এবং জনমতের দাবি স্বীকার করবেন। তদুত্তরে আবদুর রহমান (রা) বললেন যে, আলী যদি তাঁর নির্বাচন মেনে নেয়, তাহলে তিনি মতামত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। পরিশেষে আলী (রা) সম্মত হলেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন আবদুর রহমান (রা)-এর আয়ত্তাধীন আসল।

আবদুর রহমান (রা) সেদিন বিনিদ্র রজনী যাপন করে নির্বাচনকারী প্রতিটি লোকের গৃহে গমন করলেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলী উসমানের (রা) অনুকূলে। তাদের মতামত আরো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করলেন। হযরত উমর (রা)-এর ইনতিকালের চতুর্থ দিনে উসমান (রা) ইসলামী খিলাফতের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত ও অভিষিক্ত হলেন। সকলে তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ করলেন। এ সময় তালহা (রা) রাজধানী মদীনাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরে আসলে হযরত উসমান (রা) তাঁর নিকট নির্বাচন সম্বন্ধীয় সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, তালহা যদি মনোনয়নের বিরোধিতা করেন, তাহলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন। তালহা (রা) যখন শুনলেন যে, সকলেই উসমান (রা)-কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনিও তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। একে একে সমস্ত লোক এসে হযরত উসমানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উমরের (রা) মৃত্যুর পর ইসলামি রাষ্ট্রের তৃতীয় খলিফা হিসেবে হযরত উসমান (রা) নির্বাচিত হন। তিনি ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান শিক্ষিত, সৎ ও চরিত্রবান ছিলেন। তিনি ছিলেন আরবের সেরা ধনী-এজন্য তাঁকে 'গণি বলা হত। তিনি ৩৪ বছর বয়সে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (স) তাঁর কাছে নিজের দু কন্যাকে পরপর বিয়ে দেন, এ জন্য তাঁকে যুন-নুরাইন বা দু জ্যোতির অধিকারী বলা হয়। হযরত উসমান (রা) ইসলামের খেদমতে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে ও সন্ধিতে তাঁর অবদান অসামান্য। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে তিনি তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। সকলে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৮

এক কথায় উত্তর দিন

১. হযরত উসমান কত সালে কোন বংশের কোন গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন?
২. তিনি কিভাবে কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?
৩. 'যুন নুরাইন' কার উপাধি কেন তিনি এ উপাধি পেয়েছেন?
৪. 'প্রথম হিজরতকারী' কে? কেন তাঁকে এ খেতাব দেয়া হয়?
৫. হযরত উসমান (রা) কত বছর বয়সে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উসমান (রা)-এর প্রাথমিক ও ইসলাম গ্রহণের বিষয় যা জানেন লিখুন।
২. কিভাবে হযরত উসমান (রা) এর খলিফা নির্বাচিত হন? তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

হযরত উসমান (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাঁর পর্যালোচনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের বর্ণনা করতে পারবেন
- তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের পর্যালোচনা করতে পারবেন
- তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিহীনতা নিরূপণ করতে ও তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

হযরত উসমান (রা) ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রথম ৬ বছর খুবই শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মধ্যে চলছিল। তাঁর এ সময়কার শাসনকাল গৌরবময় ছিল। আর্থিক প্রাচুর্য, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি দেশে সুখ সমৃদ্ধি এনেছিল। এসময় বেশ কিছু বিজয় অর্জিত হয়। মরক্কো থেকে কাবুল পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড়তে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর খিলাফতের পরের ছয় বছর চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় খলিফার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও অপবাদ দিয়ে রাজ্যময় খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়। এর ফলে খলিফা উসমান (রা) নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। খলিফার প্রাণ নাশের ঘটনায় খিলাফতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। যার রেশ এখনো মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান।

খলিফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়, তা হচ্ছে ঃ

১. স্বজনপ্রীতি।
২. বাইতুল মালের অর্থ অপচয়।
৩. চারণ ভূমি ব্যক্তিগত ব্যবহার।
৪. বিশিষ্ট সাহাবী আবুজর গিফারী (রা)- কে নির্বাসন।
৫. কোরআন শরীফ পোড়ানো।
৬. কা'বা শরীফের সম্প্রসারণ।
৭. কারো কারো ভাতা বন্ধ।

অভিযোগসমূহের স্বরূপ পর্যালোচনা

নিরপেক্ষ আলোচনায় হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত এ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। যেমন ঃ

১. স্বজনপ্রীতি ঃ হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে তিনি নাকি প্রশাসনে নিরপেক্ষতা বর্জন করে 'স্বজনপ্রীতি' করেছেন। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাহাবীদের অপসারণ করে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও নিজ বংশের অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দান করেন। যেমন উমর (রা) কর্তৃক নিয়োগ পারস্য বিজয়ী সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে অপসারণ করে তাঁর দুধভাই ওয়ালীদ ইবনে ওকবাকে কূফার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। রাসূলে করীম (স)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা হযরত আবু মূসা আশয়ারী, মুগীরা ইবনে শো'বা, আমর ইবনুল আ'স, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আরকাম (রা)-কে অপসারণ করে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে খলিফা উসমান (রা) বিরুদ্ধে আনীত স্বজন-প্রীতির এ অভিযোগ যথার্থ নয়। নিম্নোক্ত আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হযরত উমর (রা) পারস্য বিজয়ী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)কে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। উসমান (রা) খলিফা হওয়ার পূর্বেই উমর (রা) কয়েকটি অভিযোগের কারণে সা'দকে অপসারণ করে মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা)-কে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুগীরার অসদাচরণের কারণে কূফাবাসী খলিফা উমর (রা)-এর কাছে মুগীরার পদচ্যুতি দাবি করেন। উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে উসমান (রা)-কে মুগরীরার পদচ্যুতির কথা বলে যান, ফলে হযরত উসমান (রা) মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) কে কূফার গভর্নরের পদ হতে অপসারণ করে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে পুনরায় নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে সা'দ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বায়তুলমাল সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট থেকে অর্থ ঋণ গ্রহণ করেন এবং পরে তাদের মধ্যে তা নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এ খবর যখন খলিফা হযরত উসমান (রা) শুনলেন, তখন তিনি সা'দকে অপসারণ করে ওয়ালীদ ইবনে ওকবা (রা) কে নিযুক্ত করেন। তিনি

ছিলেন খলিফার দুধ ভাই। অবশ্য সা'দ পরবর্তীতে ওয়ালিদ মদ্যপানের অপরাধে অভিযুক্ত হলে খলিফা তাকে পদচ্যুত এবং সাইদ আল আসকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমান (রা) আবু মূসা আশয়ারীকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করার পর ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বসরার অধিবাসীগণ তাঁর বিরুদ্ধে কোরাইশদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ করলে খলিফা তাঁকে অপসারণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর পিতৃব্য আবদুল্লাহ ইবনে আমের। পারস্যে বিদ্রোহ দমন করে মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে তিনি সামরিক দক্ষতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর যোগ্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিচার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে খলিফা তাঁকে গভর্নরের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর পিতৃব্য এটা করেননি।

মিসর বিজয়ী আমর ইবনুল আস (রা) হযরত উমর (রা)-এর শাসনকালেই মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ওসমানের খিলাফতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু মিসরের রাজস্ব সচিব আবদুল্লাহ ইবনে আবি সা'দ-এর সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় খলিফা আমরকে অপসারণ করেন। তার স্থানে পালিত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে সা'দকে নিযুক্ত করেন। তাঁর দক্ষতা ও বীরত্বপূর্ণ অভিযান ইসলামের আধিপত্যকে উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে বহু অঞ্চল জয় করেছিলেন। আত্মীয় নয় যোগ্যতার কারণেই তাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা তাকে অপসারণ করে মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে নিয়োগ দেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)-কে হযরত উসমান (রা) অপসারণ করেননি, তাঁকে হযরত উমর ফারুক (রা)-ই অপসারণ করে গিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের অপসারণকে তাঁর সম্পর্কে হযরত উসমানের কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির পরিণতি বলে অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ ভুল বুঝাবুঝির জন্য তাঁর দু একজন উপদেষ্টাই দায়ী বলে মনে করা হয়। বায়তুল মাল পরিচালক আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে বার্ধক্যজনিত কারণে অপসারণ করা হয়েছিল। সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া খলিফার নিকটাত্মীয় ছিলেন। তবে তার নিয়োগ খলিফা উসমান দেন নি, খলিফা ওমর (রা) কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

কাজেই বুঝা যায় হযরত উসমান (রা)-এর মধ্যে স্বজনপ্রীতির ভাব ছিল না, স্বজনপ্রীতি থাকলে তিনি ওয়ালীদের দোষ চাপা দিয়ে কূফার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখতেন। অপর দিকে সাঈদ ইবনে আ'স (রা) খলিফার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কাজেই স্বজনপ্রীতির অভিযোগ নিতান্তই অমূলক ছিল।

২. আবুজর গিফারী (রা) কে নির্বাচন ঃ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রশ্নে যে কথাটি বেশি খ্যাত তা হল আবুজর গিফারী (রা)-কে দেশান্তর করে দেওয়া হয়েছিল এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের সাথে করা হয়েছিল কঠোর ব্যবহার। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম ঘটনাটি সত্য নয় হযরত আবুজর গিফারী (রা)-কে হযরত উসমান দেশ হতে বহিষ্কার করেননি; বরং তিনি নিজেই এক নির্জন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে, হযরত আবুজর গিফারী (রা) সম্পদের বৈধ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা করতে থাকতেন। এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। এজন্য আমীর মুয়াবিয়া হযরত উসমানকে লিখে পাঠালেন যে, তাঁকে সিরিয়া হতে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হোক। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে হযরত উসমান (রা) তাঁকে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করব। কিন্তু তিনি ছিলেন এক স্বনির্ভর বুযুর্গ। কারো দানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অতঃপর তিনি মদীনার একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে দু বছর অবস্থান করার পর অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের সাথেও কোন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। তবে যেহেতু তিনি সাবাঈ দলের প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে হযরত উসমান (রা) তাঁকে অবশ্যই অনেক বুঝিয়েছিলেন। আর তাছাড়া এটা কোন বিশেষ অপরাধের কাজও ছিল না। হযরত উসমান (রা) রাজনৈতিক কল্যাণার্থে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রকাশ্য বিচার করতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ভাতা বন্ধ করার কারণ হচ্ছে যে, হযরত উসমান (রা) গোটা মুসলিম উম্মাহকে একই কুরআনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আবু বকর (রা)-এর যুগের মাসহাফ (পাণ্ডুলিপির কপি) ব্যতীত সকল মাসহাফ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে একটি স্বতন্ত্র মাসহাফ ছিল। হযরত উসমান তাঁর মাসহাফটিও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এ কারণে খলিফাকে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। মূলত গোটা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের একই কপির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত উসমান (রা)-এর এমন অবদান মুসলিম উম্মাহ কখনো ভুলতে পারবে না। ইবনে মাসউদের কপিটি তাঁর কাছে যতই প্রিয় থাক না কেন, জাতীয় কল্যাণার্থে হযরত উসমান (রা) তাঁর কাছে চেয়েছিলেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে খলিফার হাতে প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কিছুতেই সঙ্গত ছিল না।

৩. **বায়তুল মালের অর্থব্যয়** ঃ হযরত উসমানের বিরুদ্ধে অর্থ অপচয়, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থদান ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক তায়েফ-নির্বাসিত হাকাম ইবনুল আসকে মদীনায় আসার অনুমতি দান এবং বায়তুল মাল হতে এক লক্ষ দিরহাম দান। মারওয়ানকে আফ্রিকার মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ দান, আবদুল্লাহ ইবনে খালেদকে তিন লক্ষ দিরহাম দান এবং নিজের জন্য বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা মূল্যবান অলংকার এবং নিজের জন্য বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি।

বায়তুল মাল আত্মসাত করার কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে বায়তুল মালের জন্য মহান দানশীল হযরত উসমান (রা) অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি বায়তুল মালের সম্পদের প্রতি লোভ করবেন এটা উদ্ভট কথা। হযরত উসমান তাঁর খিলাফত কালেও অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বায়তুলমাল হতে অর্থ গ্রহণের তাঁর কোন প্রয়োজনই হত না; বরং তিনি নিজের পাওনাটাও বায়তুলমালে জমা দিয়ে দিতেন।

হযরত উসমান (রা) যেমন সম্পদশালী ছিলেন, তেমন দানশীল ও ছিলেন। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আপন আত্মীয়-স্বজনকে প্রচুর সাহায্য করতেন। তাঁর এ খ্যাতিকে ভিত্তি করেই বিদ্রোহীরা বায়তুল মাল আত্মসাতের অভিযোগ বানিয়ে নেয়। এ ভুল বুঝাবুঝি তাঁর সেই ভাষণ থেকেই দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, মানুষ বলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসি এবং তাদেরকে প্রচুর দান করি। তবে আমার ভালবাসা কখনো আমাকে অন্যায়ের পথে নেয় না; বরং আমি তাদের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকেই।

৪. **মদীনার চারণভূমি ব্যবহার** ঃ মদীনার চারণভূমি বায়তুল মালের পশুর জন্য নির্ধারণ করে দেন এবং জনসাধারণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। অভিযোগকারীরা বলে হযরত উসমান (রা) এ চারণভূমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। জান্নাতুল বাকী চারণভূমি সংক্রান্ত ঘটনার মূলকথা হল- কোন কোন চারণভূমি উমরের (রা) যুগ হতে বায়তুল মালের গবাদি পশুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও হযরত উসমান (রা)-এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুধু ঐ সকল চারণভূমিই নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করেছি যেগুলো আমার খিলাফতের আসনে অভিষিক্ত হওয়ার আগে নির্দিষ্ট ছিল। আমার নিকট এ মুহূর্তে দুটি উট ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে অধিক উট ও বকরীর মালিক ছিলাম। হজ্জের সময়ের জন্য রক্ষিত দুটি উট ছাড়া আমার কাছে আর কোন উট নেই। কাজেই এ অভিযোগ কত যে অসত্য তা সহজে বুঝা যায়।

৫. **কুরআন মজীদে অগ্নিসংযোগ করা** ঃ হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে পবিত্র কুরআন দগ্ধীকরণ তার মধ্যে অন্যতম। বিরুদ্ধবাদী স্বার্থান্বেষীগণ এ বলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে থাকে যে, খলিফা হযরত উসমান (রা) আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন আগুনে পুড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। কুরআন শরীফ ভস্মীভূত করার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপেই ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে। কেননা হযরত উসমান (রা) কুরআনের নির্ভুলতা রক্ষার্থে সাহাবাদের পরামর্শক্রমেই আঞ্চলিক ভাষার কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল কুরআনের পাণ্ডুলিপি যেন পৃথিবীতে না থাকে এজন্যই এ কাজটি তিনি করেছেন।

রাসূল (স)-এর উপর কুরআন একটু একটু করে পূর্ণ ২৩ বছর তা অবতীর্ণ হয়, আর ওহী লেখকগণ সাথে সাথেই তা গাছের ছালে, পশুর চামড়ায় এবং পাথরের উপর লিখে রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা) তার সবগুলো একত্রিত করে রাখেন এবং ইনতিকালের সময় হাফসা (রা)-এর নিকট রেখে যান। হযরত উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল, যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে শব্দের উচ্চারণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। আর নব দীক্ষিত অনারব মুসলমানের জন্য ছিল কুরআন পাঠ করা অধিকতর জটিল। খলিফা হযরত উসমান (রা) মহাগ্রন্থ আল কুরআন পাঠের এ জটিলতা,

উচ্চারণ ও ভাষার পার্থক্য দূর করে বিশ্বের সকল মুসলমান যেন একই পাণ্ডুলিপি অনুসারে কুরআন পাঠ করতে পারে, এজন্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবি হাফসা (রা) হতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুরূপ আরো ৬টি কপি করা হয়। যার ৪টি কপি বসরা, কূফা, দামেস্ক ও মক্কা এ চার প্রদেশে প্রেরণ করা হয় এবং বাকি ২টি কপি মদীনায় রাখা হয়। আর তাছাড়া বাকি যত পাণ্ডুলিপি যার কাছে ছিল সব পুড়িয়ে দেয়া হয়।

কুরআন দগ্ধ করাকে ঘটনা অভিযোগকারীদের জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষার্থেই এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বস্তুত এটা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ইস্যু তো নয়ই; বরং একটি অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব, যার ফলে বিশ্বের সকল মুসলমান একই ধরনের কুরআন পড়ছে।

৬. **কা'বা শরীফের সম্প্রসারণ ঃ** হযরত উমর কাবা ঘর সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার এ অসমাপ্ত কাজ উসমান (রা) শেষ করেন। এ কাজের জন্য অনেকের জমি অধিগ্রহণ করা হয়। জমির মালিকগণ জমির মূল্য দাবি করে, ইতোপূর্বে যা দাবি করত না। পরে হযরত উসমান (রা) জমির মূল্য দিতে চাইলে মালিকগণ তা নিতে অস্বীকার করে। খলিফা বিশৃঙ্খলাকারীদের কারারুদ্ধ করেন। এতে জনগণ অসন্তুষ্ট হন। আর সুযোগ সন্ধানীরা বলে বেড়ায় উসমান (রা) অন্যায়ভাবে জমি দখল করে নিয়েছেন। কাজেই এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই।

৭. **ভাতা বন্ধ ঃ** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (র) এবং হযরত উবাই (রা)-এর ভাতা ভুল বুঝাবুঝির কারণে বন্ধ করে দেন। অবশ্য হযরত উসমান (রা) পরে তাঁর প্রাপ্য ইবনে মাসঊদের ইনতিকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারীকে পৌঁছে দেন।

এছাড়াও শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আসতে লাগল, তখন খলিফা অভিযোগকারীদেরকে পরবর্তী হজ্জের সময় তাদের অভিযোগসমূহ নিয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। শাসনকর্তাগণ সকলেই আসলেন। কিন্তু কোন অভিযোগকারী সেখানে উপস্থিত হয়নি। এতে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণিত হল। তারপর খলিফা এ ধরনের অনিষ্টকর কার্যাবলির অবসান ঘটাবার জন্য শাসনকর্তাদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, খলিফা অনিষ্টকর নেতৃবর্গকে কঠোর হাতে দমন করে বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। কিন্তু হযরত উসমান ছিলেন শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি চাইলেন না যে, তাঁর নিজ স্বার্থের জন্য শত শত জীবন বিনষ্ট হোক। এমনকি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাসভবনে দ্বাররক্ষী বা দেহরক্ষী মোতায়েন করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সর্ববিধ গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ তাঁকে ভুল বুঝলো।

উপরের পর্যালোচনায় দেখা যায়, হযরত উসমানের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগই ছিল ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হযরত উসমান (রা)-কে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ইসলামি সমাজের ক্ষতি সাধন করাই ছিল গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য। তাই তাদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিলেও তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। সুতরাং দেখা যায়, খলিফা উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার হত্যার পেছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ।

সার-সংক্ষেপ

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) ১২ বছরের খিলাফত আমলের প্রথ ছয় বছর শান্তিপূর্ণ এবং সুখ্যাতির সাথে কেট যায়। এ সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বেশ বিস্তার ঘটেছিল। রাজ্য বিস্তার, আর্থিক প্রাচুর্য, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি সাম্রাজ্য ময় সুখ সমৃদ্ধি এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ইহুদি চক্রান্তের অংশ হিসেবে দেশে স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, কুচক্রী মহল নিরপরাধ খলিফার বিরুদ্ধে কিছু অমূলক অভিযোগ এনে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ দাঁড় করায়। যেসব অমূলক অভিযোগের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হল তাঁর মধ্যে ছিল (১) স্বজনপ্রীতি (২) বায়তুল মালের অর্থ অপচয় (৩) চারণভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহার (৪) সাহাবী আবুজর গিফারী (রা) কথিত নির্বাসন (৫) কুরআন শরীফ পোড়ানো (৬) কাবা'র সম্প্রসারণ এবং (৭) কারো কারো ভাতা বন্ধ। অবশ্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এসব অভিযোগের কোনটাই সত্যতা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.৯

এক কথায় উত্তর দিন

১. তৃতীয় খলিফা উসমান (রা) কত বছর খিলাফত পরিচালনা করেন?
২. তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগটি কি?
৩. বায়তুল মালের অর্থ অপচয়ের অভিযোগটি কি এবং তা কি সত্য বলে প্রমাণিত?
৪. চারণ ভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহারের অভিযোগটি আসলে সত্য কী?
৫. সত্যিকি হযরত উসমান 'কুরআন শরীফ' পুড়িয়েছিলেন?
৬. কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ কি হযরত উসমানের অপরাধ কি না?
৭. কার কার ভাতা বন্ধ করা হয়েছিল এবং কেন?
৮. বিশিষ্ট সাহাবী আবুজর গিফারীর নির্বাসনের কাহিনীটি কি?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলো কি কি?
২. স্বজন প্রীতির অভিযোগ সমূহ পর্যালোচনা করে দেখান যে আসলে অভিযোগটির কোন ভিত্তি নেই।
৩. আবুজর গিফারীর সাথে হযরত উসমানের আচরণ কি ছিল তা তুলে ধরুন এবং প্রমাণ করুন হযরত উসমান (রা) সঠিক অবস্থানে ছিলেন।
৪. বায়তুল মালের অপচয়ের অভিযোগটি কি? তা পর্যালোচনা করুন।
৫. কুরআন মজীদ পোড়ানোর অভিযোগ আসলে কি? এটা কি উসমানের (রা) জন্য জরুরি ছিল না?
৬. হযরত উসমান (রা) কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ করতে কেন গেলেন?
৭. মদীনার চারণ ভূমি কি হযরত উসমান আদৌ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতেন?
৮. কার কার ভাতা তিনি বন্ধ করেছিলেন? এবং কেন এটা তিনি করতে গেলেন?

হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণসমূহ নিরূপণ করতে পারবেন
- তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কি কি পরোক্ষ কারণ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ ৬ বছর ছিল সংকটময়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলবস্থা ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। তাঁর বিরোধীরা নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হযরত উসমানের (রা) হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদাদায়ক ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সব কারণ চিহ্নিত করেছেন তা হল-

হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল পূর্ববর্তী পাঠে তা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থপরতা বৈষম্য, গোত্রীয় কোন্দল, বিলাস-ব্যসন ধর্মের প্রতি শৈথিল্যভাব দেখা দেয়। এসবের কারণে উসমানের খিলাফত কালে নানা রকম অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। যার ফলে ইসলামের মহান তৃতীয় খলিফার করুণ পরিণতি ঘটে। ঐতিহাসিকগণ পরোক্ষ কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করতে চান।

১. গণতান্ত্রিক শাসনের অপব্যবহার ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ও তা মেনে চলা হত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগে অবাধ মেলামেশা, বাক-স্বাধীনতা, সমালোচনার পূর্ণ অধিকার ভোগ করার ফলে বিদ্রোহীরা উসমানের (রা) খিলাফতে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রের সর্বত্র অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

২. আদর্শচ্যুতি ও বিজ্ঞ সাহাবীদের অনুপস্থিতি ঃ হযরত উসমানের (রা) খিলাফত কালের শেষের দিকে বড় বড় বিজ্ঞ সাহাবীগণ ইনতিকাল করতে থাকেন। সাহাবীদের আদর্শ, ত্যাগ ও চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। বড় বড় সাহাবীগণ প্রথম খলিফা ও দ্বিতীয় খলিফাকে প্রশাসন চালাতে নানাভাবে উপদেশ দিবেন ও সাহায্য করতেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উসমান (রা) এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া যে কয়েকজন অল্পসংখ্যক সাহাবী সে সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁরাও হযরত উসমান (রা)-কে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেননি। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে ধন বৈষম্য, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকারতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিলাসপ্রিয়তা বেড়ে যায়। স্বার্থবাদীরা সুযোগ খুঁজতে থাকে ক্ষমতা দখল করার জন্য। ফলে বিদ্রোহীদেরকে বাধা দান করার মত লোকের অভাব ছিল।

৩. হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি ঃ

মহানবী (স)-এর আবির্ভাবের আগে থেকেই হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্ব চলছিল। রাসূলের আগমনে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর ও উমর (রা)-এর সময়ে তা তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বে আসার পর নানা কারণে উভয় বংশের লোকদের মধ্যে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতর ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। হযরত উসমানের (রা) বংশের কেউ কেউ দায়িত্ব পূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হলে এটাকে স্বজনপ্রীতি বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহীরা হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে সক্ষম হয়।

৪. কুরাইশ ও অ-কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ ইসলামের বিজয় অভিযানে এবং অন্যান্য সকল কাজে সাধারণ মুসলমানগণ কুরাইশদের সাথে এক কাজ করে। কিন্তু কুরাইশগণ সাধারণ মুসলমানের ত্যাগের কথা সব সময় বিবেচনায় আনত না। তারা প্রায় সময় সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে থাকে এবং সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। তা ছাড়া খিলাফত ও শাসন-কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতেই থাকবে এ রকমের জনশ্রুতি অকুরাইশদেরকে ক্ষুব্ধ করে। এছাড়া হযরত উসমান (রা) হযরত উমর (রা)-নীতি পরিবর্তন করে কুরাইশদেরকে আরবের বাইরে বিজিত

অঞ্চলে জমি-জমা খরিদ করার সুযোগ দেন। এতে কুরাইশ ও অকুরাইশ জমি মালিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বসরা ও কূফায় এ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু খলিফার সঙ্কটজনক সময়ে কুরাইশগণ খলিফাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করেননি; বরং হাশেমী গোত্রের অনেকটা অসহযোগিতা বিদ্রোহীদেরকেই উৎসাহিত করে।

৫. অমুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ ঃ ইসলামের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় অমুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ করে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ভাল চোখে দেখেনি। পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও এরা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে। হযরত উসমানের (রা) সময়ে তারা বিদ্রোহীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে যোগদান করে।

৬. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিভেদ ঃ হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সময়ে আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে ইসলামের খেদমতে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোন রকম বিভেদ দেখা দেয়নি। হযরত উসমানের সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মুহাজিরগণ অবহেলিত হয় এবং তাঁরা মজলিস উল-খাস-এর সদস্যপদ হতে বঞ্চিত থাকে। এতে তাঁদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

৭. ইহুদি ইবনে সা'বার প্রচারণা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ ছিল ইয়ামানী ইহুদি। এ কপটচারী নিজ স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামী খিলাফতকে ধ্বংসই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বসরা, কূফা ও মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্ত সংগঠন গঠন করে সঙ্গত-অসঙ্গত নানাবিধ প্রসঙ্গ ও বিভ্রান্তিকর অজুহাত এবং প্রশ্ন তুলে খলিফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত ও বিদ্রোহী করে তুলতে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালিয়ে স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী করে তোলে।

৮. মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক আচরণ ঃ খলিফা উসমানের (রা) জামাতা মারওয়ান প্রধান উপদেষ্টা হওয়ায় তার পরামর্শ ও কার্যকলাপে খলিফা স্বয়ং অভিযুক্ত হতেন। মারওয়ান ছিলেন স্বার্থপর, কূটনীতিবিদ ও উচ্চাভিলাষী। হযরত উসমানের (রা) স্বভাব ছিল নরম প্রকৃতির। মারওয়ান এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে উমাইয়াদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য স্বগোত্রীয় লোকদের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান। হাশেমীদের রাখেন সকল সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত। তাঁর স্বার্থপরতা মুসলিম সাম্রাজ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সরলমতি খলিফার জন্য নির্মম পরিণতি ডেকে আনে।

৯. হযরত উসমানের (রা) উদারতা ঃ খলিফা উসমানের (রা) উদারতা ও সরলতা তাঁর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। অনেক সময় ঘোর অপরাধীকেও শাস্তি না দিয়ে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। এ উদারতার সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা বিদ্রোহের সাহস পায়।

১০. কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঃ অবস্থার পরিবর্তন ও কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন অনভ্যস্ত দুরন্ত আরবদের কাছে ভাল লাগেনি। তাছাড়া হযরত উসমানের সময়ে বিজয় অভিযান বন্ধ রাখা হয়। যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে তাদের অলসভাবে কাটাতে হয়, যা তারা মোটেও পছন্দ করত না। এছাড়া যুদ্ধ থাকলে বিজয়ের সাথে সাথে প্রচুর অর্থ-সম্পদ পাওয়া যেত– তাও বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের আয়ের অন্যতম উৎস 'ফায়ভূমি' উমরের (রা) সময় রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যায়। এ কারণে আরব যোদ্ধারা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ফায়ভূমির সমস্ত আয় দাবি করে। হযরত উসমান পূর্ববর্তী খলিফার রাজস্ব নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন কিন্তু আরব যোদ্ধাদের ঐ দাবি মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাদের অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বার্নাড লুইস এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন যে, "এ বিদ্রোহ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাযাবরদের বিদ্রোহ, যা কেবল উসমানের (রা) খিলাফতের বিরুদ্ধে নয়, যে কোন ব্যক্তির পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।"

সার-সংক্ষেপ

বিরোধীরা তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ দু' বছরে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলাবস্থা, সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি কতগুলো পরোক্ষ কারণ পাওয়া যায়, এগুলো হচ্ছে। তারা নানা অজুহাতে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিদ্রোহের (১) গণতান্ত্রিক শাসনের অপব্যবহার (২) আদর্শচ্যুতি ও বিজ্ঞ সাহাবীদের অনুপস্থিতি, (৩) হাশেমী ও উমাইয়া বংশের মধ্যে দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি (৪) কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি (৫) অমুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা (৬) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব তৈরি (৭) ইয়াহুদি ইবনে সাবাহ অপপ্রচার (৮) মন্ত্রী মারওয়ানের কিছু আচরণ (৯) হযরত উসমানের (রা) সীমাহীন উদারতা ও সরলতা এবং (১০) সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। এসবের কারণেই বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে দিয়াছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.১১

এক কথায় উত্তর দিন

১. গণতান্ত্রিক শাসনের ফলে কিভাবে বিদ্রোহীরা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ পায়?
২. বিজ্ঞ সাহাবীদের অনুপস্থিতির ফলে কি হয়েছিল?
৩. হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে আসলে কি দ্বন্দ্ব ছিল? কিভাবে তা উসকে দেয়?
৪. কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে কিভাবে বিরোধ দেখা দেয়?
৫. অমুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ কেন ছিল?
৬. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল কি?
৭. ইয়াহুদি চর ইবনে সাবা কে?
৮. মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক আচরণ কি ছিল?
৯. হযরত উসমানের (রা) কোন গুণ বিদ্রোহে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল?
১০. কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে সমন্তোধের কারণ কি?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ৩টি বড় ধরনের পরোক্ষ কারণ লিখুন।
২. কুরাইশ ও অকুরাইশ এবং হাশেমী ও উমাইয়াদের পরিচয় দিন ও তাদের দ্বন্দ্বের কারণ বের করুন।
৩. ইবনে সাবাহ কে? কেন সে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল?

হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- তাঁর হত্যার ঘটনা বলতে পারবেন
- তাঁর হত্যার ফলাফল ও মুসলিম বিশ্বে এর কি প্রভাব পড়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে উল্লিখিত কারণ সমূহ হযরত উসমানের (রা) খিলাফতের শেষের দিকে সারা দেশে গোলযোগ বাড়তে থাকে। হযরত উসমান সমস্ত গভর্নরদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। মতবিরোধ নিরসনের উপায় বের করাই ছিল এ পরামর্শ সভার মূল লক্ষ্য। গভর্নরগণ সমবেত হন, অধিকাংশ গভর্নরই বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কথা বলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) বলেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

এদিকে বিদ্রোহীরা ঠিক করে পরামর্শ সভা থেকে গভর্নর (রা) ফিরে এলে তারা তাঁদেরকে প্রদেশসমূহে প্রবেশ করতে দেবে না। এভাবে তারা গণবিদ্রোহ শুরু করবে। তাদের ষড়যন্ত্র সফল হল না। তবে কূফার গভর্নর সাইদ ইবনুল আস (রা) কে তারা কূফায় প্রবেশ করতে দিল না। হযরত উসমান (রা) কুফাবাসীদের ইচ্ছানুসারে হযরত আবু মূসা আশআরীকে (রা) কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

গভর্নরদের ফিরে যাওয়ার পর উসমান (রা) কেন্দ্র থেকে তদন্ত দল প্রত্যেক প্রদেশে পাঠান। মিসর ব্যতীত অন্যসব প্রদেশের তদন্ত রিপোর্ট বিদ্রোহীদের বিপক্ষে গেল। এসময় হঠাৎ মিসরের কিছু লোক মদীনায় এসে খলিফার কাছে মিসরের শাসক আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নির্যাতনের অভিযোগ পেশ করে। হযরত উসমান (রা) মিসরের শাসককে তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা বা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীদের নির্মমভাবে প্রহার করল। ফলে তাদের একজন মারা গেল।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিসর থেকে প্রায় সাতশ লোক মদীনায় গিয়ে মসজিদে নব্বীতে নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে। একই সময় বসরা ও কূফার বিদ্রোহীরাও এসে জমায়েত হল। গোলযোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। হযরত উসমান (রা) গোলযোগ নিরসন ও জনগণের যথার্থ অভিযোগের প্রতিবিধান করতে সব সময়ই তৈরি ছিলেন। তিনি এ জনসমাবেশের খবর শুনে হযরত আলী (রা)-কে ডেকে বলেন, আপনি এসব লোককে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমি তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। এখন থেকে আমি আর বনু উমাইয়াদের পক্ষপাতিত্ব করব না। মারওয়ান, মুয়াবিয়া, ইবনে আমের, ইবনে আবী সারাহ এবং সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর পরামর্শে কাজ করব না। বড় বড় সাহাবাগণের পরামর্শ অনুসারে খিলাফতের কাজ-কর্ম সম্পাদন করব।

সুতরাং তিনি মিসরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুত করে মিসরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে তার স্থানে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। এতে বিদ্রোহীরা ফিরে যায়। ঘটনা তদন্তের জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দলও তাদের সাথে মিসর যাত্রা করে। জুমআর দিন হযরত উসমান (রা) মসজিদে ভাষণ দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরলেন। লোকজন সবাই আনন্দিত হল এই ভেবে যে, এখন বিরোধ ও বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটবে।

মিসরীয় প্রতিনিধি দলটি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে সবেমাত্র তিন মাইল পথ এগিয়ে গেছে। এমন সময় দেখা গেল একজন হাবশী দাস উটের পিঠে চড়ে অতি দ্রুত মিসরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় তাকে পাকড়াও করা হল। সে বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা) আমাকে মিসরের গর্ভনরের কাছে পাঠিয়েছেন। তার কথায় সন্দেহ দেখা দিল। দেহ তল্লাশি করে তার নিকট উসমানের সীল মোহরকৃত গভর্নর ইবনে আবী সারাহকে দেয়ার জন্য একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল "মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে ফেল।" এ চিঠি দেখে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) ও অন্যান্যরা উত্তেজিত হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত তালহা, যুবাইর, সাদ ও আলী (রা)-কে ডেকে চিঠি দেখান। তারা সবাই চিঠি, উট ও দাসটিকে নিয়ে হযরত উসমানের (রা) কাছে গেলেন। হযরত উসমান (রা) কসম (শপথ) করে চিঠি অস্বীকার করলেন, পরে জানা গেল, পত্রদাতা হচ্ছে মারওয়ান। হযরত উসমানের (রা) ব্যাপারে সবাই সন্দেহমুক্ত হলেন।

কিন্তু বিদ্রোহীরা দাবি করে বসল যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উসমান (রা) তা করতে রাজি হলেন না। এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বেড়ে চলল। এবার বিদ্রোহীরা দাবি করে বসল, "হযরত উসমান (রা)-কে খিলাফতের মসনদ থেকে সরে যেতে হবে।" হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ "আমার মধ্যে জীবন থাকতে আমি আল্লাহর দেয়া খিলাফত নিজ হাতে খুলে ফেলবো না এবং মহানবীর (স) অসীয়ত মত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করব।"

এরপর বিদ্রোহীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে হযরত উসমানের বাসভবন অবরোধ করে রাখল। অবরোধ ৪০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল এবং তাঁর বাড়িতে পানি পর্যন্ত পৌঁছানো নিষেধ করে দেয়া হল। হযরত আলী (রা) অনেক কষ্টে কয়েকবার পানি পৌঁছান। হযরত উসমান (রা) বারবার বিদ্রোহীদের বুঝানোর চেষ্টা করেন, মর্মস্পশী ভাষণ দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাতে কোন রকম সাড়া দেয়নি। ভক্ত-অনুরক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) তাদেরকে সে অনমুতিও দেননি।

হযরত আলী, তালহা, যুবাইর ও সাদ (রা) প্রমুখ তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। কারণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি নেই। তাঁরা তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু খলিফার পদত্যাগ অথবা মারওয়ানকে হস্তান্তর ছাড়া তারা তাদের স্থান ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা), তালহা (রা) যুবাইর (রা) তাদের ছেলেদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় হযরত উসমানের বাড়ি পাহারায় মোতায়েন করেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইমাম হাসান (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হলেও আপন জায়গায় অনড় থাকেন। কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

বিদ্রোহীরা দেখলেন, ছাতুর মওসুম শেষ হয়েছে। লোকজন শীঘ্রই মদীনায় ফিরে আসবে এবং সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা হযরত উসমানকে (রা) হত্যার জন্য পরামর্শ শুরু করল শেষ পর্যন্ত তারা হযরত হাসান, হুসাইন (রা) প্রমুখের বাধার মুখে দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে প্রাচীর টপকিয়ে ছাদে ওঠে হযরত উসমানের (রা) কাছে গিয়ে পৌঁছে। এদের সামনে ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর দাড়ি ধরে টান দেন। হযরত উসমান (রা) বললেন ভাতিজা তোমার পিতা হযরত আবু বকর (রা) যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এদৃশ্য মোটেই পছন্দ করতেন না।" একথা শোনামাত্র তিনি ফিরে যান। অন্যরা অগ্রসর হয়ে হামলা চালায়, একজন লোহার খণ্ড ও দ্বিতীয়জন বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তখন তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। তৃতীয়জন তরবারি দিয়ে আঘাত করে। স্ত্রী নায়েলা হাত দিয়ে তা ঠেকাতে গেলে তাঁর তিনটি আঙ্গুল কেটে পড়ে যায়। তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে হযরত উসমানের (রা) জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

৩৫ হিজরির ১৮ যিলহাজ্জ জুমআর দিন আসরের সময় মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখে হযরত উসমান শাহাদাত বরণ করেন। লাশ দু দিন পর্যন্ত দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকে, বিদ্রোহীদের ভয়ে কেউ অগ্রসর হওয়ার সাহস করল না। শনিবার রাতে কিছুসংখ্যক মুসলমান জীবনবাজি রেখে জানাযা আদায় করে জান্নাতুল বাকীর পেছনে তাঁকে সমাহিত করেন।

ফলাফল

হযরত উসমানের (রা) হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাস একটি বেদনাবিধূর ঘটনা। তাঁর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা এবং তা ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাওসেন (ঘণফফদমল্রণভ) বলেন, ৎকদণ বলরঢ়ণর মত খ্রবটভ ষট্র বমরণ ণযমডদ বটপধভথ´দটভ টভহ র্মদণর ণশণর্ভ মত ভ্রফটবধড ঔর্ধ্বমরহ.ঃ অর্থাৎ উসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোন ঘটনার চেয়ে অধিকতর যুগান্তকারী ঘটনা।

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে

ক. খিলাফতের মর্যাদাহানি ঃ খিলাফত একটি পবিত্র আসন কিন্তু হযরত উসমান (রা) হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। বার্নার্ড লুইস বলেন, "বিদ্রোহী কর্তৃক খলিফার হত্যাতে যে বেদনাবিধূর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়, তা ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতীক, খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছিল।" নিরস্ত্র খলিফাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে খিলাফতের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করে।

খলিফা ও খিলাফতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কমে আসে। খোদাবক্স বলেন, "এ হত্যাকাণ্ড সর্বকালের জন্য খলিফার ব্যক্তিগত পবিত্রতা নষ্ট করে।"

খ. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঃ হযরত উসমানের (রা) হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের একতা বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন কার্যাবলির প্রতিবাদে এবং হত্যার প্রতিবাদে যে সকল মতবাদ ও দল-উপদলের উদ্ভব হয়, তা পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করে। মুসলিম জাতি শিয়া, সুন্নী, খারেজী, রাফেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ফের্কা বা উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।

গ. ইসলামের পবিত্রতা বিনষ্ট ঃ এরপর থেকে মানুষের মন হতে ইসলামের পবিত্রতা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হতে থাকে। মানুষ বিভিন্ন কোন্দলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

২. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

ঐক্য বিনষ্ট ঃ হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিমের মধ্যে যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংহতি ছিল, তা বিনষ্ট হতে শুরু করল। এর ফলে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটে। সহনশীলতা ও ধৈর্য, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও মমত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হতে থাকে। আরব-অনারব, কুরাইশ, অকুরাইশদের মধ্যে বিরোধের জন্ম দেয়। এ হত্যাকাণ্ড মক্কার হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে উমাইয়া বংশের সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া মদীনার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। হযরত উসমানের (রা) হত্যার প্রতিশোধ ও বিচারের অজুহাতে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। অবশেষে মুয়াবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

গৃহ যুদ্ধের সূচনা ঃ এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে নাশকতামূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। জোসেফ হেলের ভাষায়, ৎকদণ বলরঢণর মত খ্রবটভ ষট্র ট্রধথভটফ তমর ডধশধফ ষটর.ঃ উসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেত"। ওয়েল হাউসেন বলেন, ৎকদণ নটভভ্র থর্টণ মত ডধশধফ ষটর ষট্র মযণভণঢ টভঢ ভণশণর টথটধভ ডফম্রণঢ.ঃ (গৃহযুদ্ধের ফটক খুলে যায় যা আর কখন বন্ধ হয়নি।) হযরত আলীর (রা) খিলাফতে যে কয়টি গৃহযুদ্ধ হয় তা এ হত্যাকাণ্ডেরই প্রতিক্রিয়া। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা এবং পতনের পরও এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি; বরং মুসলিম উম্মাহ এখন পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া বহন করে চলেছে।

মদীনার প্রাধান্য লোপ ঃ এরপর থেকে মদীনার প্রাধান্য লোপ পায়। কেননা পরবর্তী খলিফাগণ সুবিধামত রাজধানীকে কূফা, দামেশক, বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। ফলে মদীনার রাজনৈতিক মর্যাদা কমে যায়। মদীনা একটি পবিত্র ধর্মীয় নগরী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩. সামরিক ক্ষেত্রে ঃ এ হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের বিজয়াভিযান আপাতত বন্ধ হয়ে যায় এবং বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. তাত্ত্বিক দিক ঃ হযরত উসমানের (রা) হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে যে সকল রাজনৈতিক হট্টগোল দেখা দেয়, তাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করতে থাকে।

৫. ইসলামী গণতন্ত্রের বিলুপ্তির সূচনা ঃ হযরত উসমানের (রা) হত্যার পর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে ইসলামী গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের উত্থান শুরু হয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পেছনে কুচক্রী মহলের কারসাজিই কাজ করেছে। ফলে ইসলামী বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যার খেসারত মুসলমান কখনও শোধ করতে পারেনি।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উসমান (রা) খিলাফতের শেষে ছয় বছরে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলাবস্থা, সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরোধীরা নানা অজুহাত তুলে রাজ্য ময় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু তিনি উদারতার কারণে সে সব বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করতে পারেননি। ফলে নিজের জীবন দিতে হয়। তার নির্মম হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে এক বেদনা দায়ক ঘটনা। এ হত্যাকাণ্ডের ফলাফল সুদূর প্রসারী ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১১

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১. হযরত উসমান (রা) কুফা বাসীদের ইচ্ছানুসারে হযরত ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ (রা) কে কুফার গভর্নর করেন।

২. মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুৎ করে সেখানে ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ কে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

৩. হযরত উসমান (রা) বললেন- 'আমার মধ্যে জীবন থাকতে আমি আল্লাহর দেয়া ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ নিজ হাতে খুলে ফেলবো না।

৪. ৩৫ হিজরি ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ জুমআর দিন ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ সময়ে মোতাবেক ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন হযরত উসমান শাহাদাত বরণ করেন।

৫. ঐতিহাসিক ওয়াল হাউসেন বলেন, উসমান হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যে কোন ঘটনার চেয়ে অধিকতর ঞঞঞঞঞঞঞঞঞঞ ঘটনা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উসমান (রা) হত্যার ঘটনা সংক্ষেপে লিখুন।

২. হযরত উসমান (রা) হত্যার ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়?

৩. হযরত উসমান (রা) হত্যার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

হযরত উসমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা) কেমন ছিলেন বলতে পারবেন
- হযরত উসমানের (রা) চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত উসমানের (রা) কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

চরিত্র

ইসলাম ও রাসূলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন হযরত উসমান (রা)-তাঁর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মাদর্শের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ আসন দখল করে আছেন। তিনি ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করে ৮২ বছর বয়সে ১৭ জুন, ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মধ্যমাকৃতির, শ্মশ্রুতমণ্ডিত সুপুরুষ ছিলেন।

১. ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ

মহানবীর (স) নিত্য সঙ্গী ঃ হযরত উসমান (রা) মহানবীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সকল সঙ্কটে ও বিপদে তিনি রাসূলের পাশে ছিলেন। রাসূলের পাশে থেকে ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন।

অকাতরে দান ঃ হযরত উসমান (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের বিত্তশালী লোকদের জন্য আদর্শ।

দেশত্যাগ ঃ ইসলাম গ্রহণ করায় স্বজাতির লোকেরা সীমাহীন নির্যাতন চালালে তিনি নির্যাতিত বহু সাহাবীকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তারপর মহানবীর (স) সাথে মদীনায়ও হিজরত করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে ঃ হুদাইবিয়ার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তিনি কুরাইশদের কাছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নবীর দূত হিসেবে কাজ করেন।

যুদ্ধ-জিহাদে দান ঃ হযরত উসমান (রা) ইসলামের দুর্দিনে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় অকাতরে দান করতেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি ১০০০ দিরহাম দান করেন এবং রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক হাজার উট দান করেন।

মসজিদে নব্বী সম্প্রসারণে ঃ স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মহানবী (স) মসজিদে নব্বীর সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি মসজিদ সংলগ্ন জমি ক্রয় করে এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

দুস্থ ও দাসদের সেবায় ঃ তিনি দুস্থ মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয় করতেন, দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য বিতরণ করতেন। তিনি মুসলিম দাসদেরকে অত্যাচারী মনিবদের কাছ থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন।

২. ধর্মনিষ্ঠা ও সততা

হযরত উসমান (রা) ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর সততা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা এবং বিনয়ের জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নিরহংকারী, বিনয়ী, আমানতদার, দানশীল হিসেবে তিনি মহানবী (স) প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিথ্যা ও পাপাচার হতে তিনি ছিলেন পবিত্র এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় তাঁর চোখ ছিল সজল। অবসর সময়ে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন।

৩. সহজ-সরল দয়ালু মানুষ

তিনি ছিলেন খুব সহজ-সরল দয়ালু মানুষ। তিনি অতিরিক্ত উদার, স্নেহপ্রবণ এবং অসাময়িক ছিলেন। এজন্য গুরুতর অপরাধীকেও ক্ষমা করে দিতেন। প্রয়োজনের সময়ও তিনি কারো প্রতি কঠোর হতে পারেননি। তাঁর সরল দয়ালুতার

সুযোগে অসৎ ও দুষ্ট লোকেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিল। আসলে তাঁর মত জনদরদী, দীন-দুঃখীর বন্ধু, প্রজাবৎসল শাসক পৃথিবীতে বিরল। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক মহান খলিফা।

৪. নম্র ও ভদ্র

মহানবীর (স) একটি বাক্যে হযরত উসমানের চরিত্র চিত্রিত করা যায়। তিনি বলেন, "আমার সাহাবীদের মধ্যে উসমান (রা) সবচেয়ে নম্র ও ভদ্র।" বস্তুত হযরত উসমানের (রা) চরিত্রে বিনয়, ধৈর্য, সততা, সারল্য, সহনশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর আচরণে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পরপর দু' কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন।

আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েও তিনি দীন-হীন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। খলিফা হিসেবে বাইতুল মাল হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করেননি। ইসলামের উদ্দেশ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

৫. ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক ঃ রাষ্ট্রের সংহতি অটুট ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। অন্যের রক্তপাত অপেক্ষা নিজ জীবন কুরবানীর মাধ্যমে তিনি যে মহান ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের নজীর স্থাপন করেছেন, জগতের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক।

শাসন ব্যবস্থা ও কৃতিত্ব

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা) খিলাফতের দিক হতে সফল খলিফা ছিলেন। খিলাফতের প্রথম দিকে উমর (রা)-এর আমলে বিজিত অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। হযরত উসমান তা দৃঢ়তার সাথে দমন করে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি বিরাট নৌ-বহর তৈরি করেন, যার দ্বারা অনেক উপদ্বীপ জয় করেন।

তিনি বিজিত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা এমন সুদৃঢ় করেছিলেন যে, মুসলমানদের গৃহবিবাদের সময়ও সেসব অঞ্চল বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি।

গণতান্ত্রিক শাসক ঃ কুরআন ও সুন্নাহর নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র দ্বারা ইসলামী শাসন শুরু হয়। হযরত ওমর (রা) একে পরিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক করেন। এ নীতি হযরত উসমানের খিলাফতের প্রথম দিকে বহাল ছিল। জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ এবং শাসকদের দোষত্রুটি শোধরাবার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন। জনমতের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতেন।

পরামর্শ সভা ঃ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপারে হযরত উসমান (রা) শাসকদের একটি পরামর্শ সভা স্থাপন করেছিলেন। এসব সভাসদদের নিকট হতে লিখিত অভিমত নিতেন, রাজধানীতে এ ব্যাপারে রীতিমত বৈঠক বসত।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ রাষ্ট্রীয় সীমানা বিরাট হওয়ায় প্রদেশগুলোকে শাসনের সুবিধার্থে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। সিরিয়াকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। সাইপ্রাস, আরমেনিয়া ও তিবরিস্তানকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ঘোষণা করেন। সকল প্রদেশের মধ্যে পাঁচটি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এগুলোতে সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর ছিল। অন্যান্য প্রদেশ এদের অধীন ছিল। যদিও সকল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন গভর্নর (ওয়লী) থাকতো; কিন্তু উল্লেখিত পাঁচটি প্রদেশের গভর্নরদের মর্যাদা ছিল গভর্নর জেনারেলের। ঐ সকল প্রদেশ ও গভর্নরগণ হলেন ঃ সিরিয়া-মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। মিসর-আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারহা, বসরা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর, কূফা- আবু মুসা আসয়ারী। কানসারীন- মোসলেম ফেহরী।

সুষ্ঠু বাইতুল মালের ব্যবস্থা ঃ হযরত উসমানের সময় বাইতুল মালের তত্ত্বাবধানে ওকবা ইবনে আমের ছিলেন এবং যায়েদ ইবনে সাবিত বিচারপতি (কাযী) ছিলেন। শাসকদের কাজ-কর্ম দেখাশোনা মুহাম্মদ ইবনে মোছলেমা এবং উসামা ইবনে যায়েদের দায়িত্ব ছিল। প্রথম দিকে শাসকদের প্রতি কড়া নজর দেয়া হত।

পূর্ববর্তী খলিফার নীতি অনুসরণ ঃ হযরত উমর (রা) রাষ্ট্রের নীতি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, হযরত উসমান (রা) সেভাবেই রাখেন। বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগগুলোর উৎকর্ষ সাধন করেন। বৃত্তিসমূহ বাড়ায়ে দেয়া হয়। তাঁর সময় দেশে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণভাবে জনসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ তাঁর সময় স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দফতরের জন্য প্রাসাদ তৈরি করা হয়। জনকল্যাণের জন্য সড়ক, গৃহ, মসজিদ, মোসাফেরখানা, অতিথি শালা স্থাপন করেন। খায়বরের দিক হতে

মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাস আসত, এরফলে জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হত। হযরত উসমান (রা) মদীনার কিছু দূরে মাহজুর নামক একটি বেড়ীবাঁধ তৈরি করেন। ২৯ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদে নব্বীর প্রাসাদের কাজ নতুন করে আরম্ভ করেন। আশে পাশের জমিগুলো খরিদ করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর ইট, পাথর ও চুনার সাহায্যে একটি সুদৃঢ় প্রাসাদ তৈরি করেন।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ সৈন্য বাহিনীর সংগঠনে উমর (রা)-এর রীতিনীতি বহাল রেখে এর উৎকর্ষ সাধান করেন। সেনাবাহিনীর ব্যারাক সংখ্যা বাড়ানো হয়। যুদ্ধের ঘোড়া, উটের সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি এদের জন্য চারণভূমি সম্প্রসারণ করেন। নৌ-বহরের সংযোজন হযরত উসমান (রা)-এর সময়ই হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহচর এবং প্রতিনিধি হওয়ায় হযরত উসমান (রা) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলাম ও খলিফার গুরুত্ব বর্ণনা করে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হযরত উসমান (রা) নিজে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতেন। ইসলামি দর্শন ও চিন্তাধারা বর্ণনা করতেন। তিনি নিজে ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁর অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে সাথে নিয়ে ইলমে ফারায়েজ (উত্তরাধীকার আইন)-কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেন।

কুরআন সঙ্কলন ঃ হযরত উসমান (রা) এর প্রচেষ্টায় পবিত্র কুরআনের নির্ভর ও ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন শরীফ পাঠ, আবৃত্তি ও উচ্চারণে অসামঞ্জস্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠন করেন এবং তাদের দ্বারা একটি নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিতরণ করেন। এজন্য তাঁকে 'জামিউল কোরআন' বা কোরআন সংকলনকারী বলা হয়। তিনি যদি এ প্রচেষ্টা না চালাতেন তা হলে মহাগ্রন্থ কুরআন হয়ত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় বিকৃত হয়ে যেত।

সার-সংক্ষেপ

খোলাফায়ে রাশিদিনের তৃতীয় খলিফা ছিলেন মহানবীর (স) জামাতা যুনরাইন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)। ইসলাম ও রাসূলের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে এবং তাঁর অনুপম চারিত্রিক মহিমা ও কর্মাদর্শের কারণে ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ আসন দখল করে অমর হয়ে আছেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রভূত উন্নয়ন, সৈন্য বাহিনীর বেতনভাতা বৃদ্ধিকরণ, কাবা ঘর সম্প্রসারণ, মদীনা মসজিদের পুনঃনির্মাণ এবং কূফায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন নির্মাণ করেন। তিনি মদীনায় বাঁধ, বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা, পয়ঃপ্রণালী, আশ্রম, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। বিধবা, আতুর, অনাথ তথা দুস্থ মানবতার সেবা যত্ন করতেন। পবিত্র কুরআন শরীফ সুষ্ঠুভাবে সংকলন করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ তাঁর অমর কীর্তি। তাঁর খিলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিজয়াভিযান সুদূর আফগানিস্তান থেকে আফ্রিকা মহাদেশসহ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও সাইপ্রাস পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১২

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন-

১. হযরত উসমান (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী।
২. হযরত উসমান (রা) তাবুক যুদ্ধে এক হাজার উট প্রদান করেন।
৩. হযরত উসমানের (রা) সবচেয়ে বড় অবদান কুরআনের বিশুদ্ধ সঙ্কলন।
৪. বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
৫. হযরত উসমানের (রা) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক ছিল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উসমান (রা) এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
২. হযরত উসমানের শাসন কৃতিত্বের বিবরণ দিন।
৩. কুরআন সংকলনে হযরত উসমানের (রা) অবদান আলোচনা করুন।

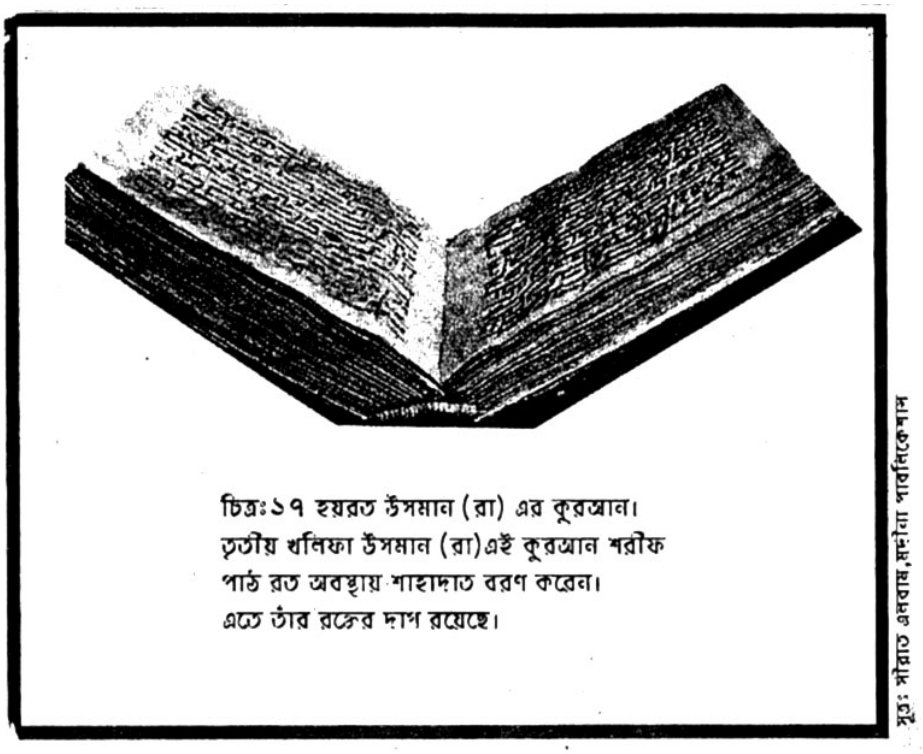

চিত্র-১৭ ঃ হযরত উসমানের সংকলিত কুরআনের একটি পৃষ্ঠা
[ইসলামী বিশ্বকোষ : অষ্টম খন্ড]

পাঠ ১৬ হযরত আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলীর (রা) প্রাথমিক জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন
- হযরত আলীর (রা) ইসলামের কি সেবা করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন
- খিলাফত লাভের পূর্ববর্তী জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে জানতে পারবেন
- তাঁর খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইসলামের সোনালি যুগের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) রাসূলে করীম (স)-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে ৬০০ খ্রি. বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতিমা। হযরত আলী (রা)-এর পিতা আবু তালিবের হাতে রাসূল (স) শৈশবে লালিত-পালিত হন। আর আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে লালিত-পালিত হন। হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) আবু তোরাব এবং আবুল হাসান সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আলী (রা) বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। বাল্যকালেই লেখাপড়া শিখেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেই তরবারি চালনা শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন বড় পণ্ডিত এবং বড় যোদ্ধা। অসি ও মসী এই দুই অস্ত্রেই দিয়েই তিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করে গেছেন।

বিবাহ

হযরত আলী (রা) ২৪ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্নেহের কন্যা বিবি ফাতিমাকে বিবাহ করেন। ফাতিমার ঘরে তাঁর তিন ছেলে হাসান, হোসাইন ও মুহসীন এবং দুই মেয়ে যয়নব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। বিবি ফাতিমা (রা) মারা গেলে হযরত আলী (রা) আরও একটি বিবাহ করেছিলেন সে ঘরেও তাঁর সন্তানাদি ছিল।

ইসলামের সেবা

হযরত আলী (রা) প্রাথমিক জীবনে বিশেষ করে দু দিকে ইসলামের খেদমত করেছিলেন, একটি হল জ্ঞানের খেদমত। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও ভাল পণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি জ্ঞানের শহর। আর আলী সে শহরের দরজা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিনি ছিলেন অসীম তেজস্বী ও সাহসী। ইসলামের প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ তলোয়ার যুলফিকার প্রদান করেছিলেন।

নবী করীম (স) সাহাবায়ে কেরাম সমভ্যিবহারে মদীনাতে হিজরতের সময় হযরত আলী (রা) মক্কাতে থেকে গেলেন। এ সময় তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর গৃহত্যাগের পূর্বক্ষণে যখন শত্রুরা তাঁর গৃহ পরিবেষ্টন করে রাখে তখন তিনি হযরত আলীকে তাঁর নিজ শয্যায় শায়িত রেখে রাতের অন্ধকারে হিজরত করেন। শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবর্তে আলী (রা)-কে দেখে বিস্মিত হল। তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করতে এসেছিল কিন্তু আশাভঙ্গ হওয়ায় অগত্যা ফিরে গেল।

সামরিক কার্যাবলী

হযরত আলী ছিলেন অসাধারণ শৌর্য ও সাহসের অধিকারী। তিনি নিজেকে জীবনের উষালগ্ন থেকেই ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরে তিনি ইসলামের পতাকা বহন করেন এবং এ যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উহুদেও তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বনু কুরায়যা গোত্রের অবরোধের সময়ও তিনি ছিলেন ইসলামের নিশান বরদার।

তিনি তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হিজরি ৬ সালে তিনি খায়বারের যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে বিখ্যাত কামুস চূর্ণ জয় করেন। মহানবী (স) খুঁশি হয়ে তাঁকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

হোদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির সময় তিনি এর লেখক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে করীম (স) যখন দশ হাজার অনুগামীসহ নগরে প্রবেশ করেন, তখন আলী (রা) সা'দের হাত হতে ইসলামি পতাকা গ্রহণ করেন। হিজরি দশ সালে আলী (রা) ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াতসহ প্রেরিত হলেন এবং তাঁর যোগ্যতাবলে সর্বপ্রথম ইয়েমেনে ইসলাম তাঁর হাতে প্রচারিত হয়।

পূর্ববর্তী খলিফাগণের প্রতি আনুগত্য

রাসূলে করীম (স)-এর ইনতিকালের পর যখন জনগণ আবু বকর (রা)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ করেন তখন আলী (রা) সেখানে হাজির ছিলেন না। কারণ পিতৃ-শোকাতুরা ফাতেমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁকে তখন গৃহেই থাকতে হয়েছে। পরে তিনি আবু বকরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বন্ধুত্বের বেষ্টনিতে আবদ্ধ হয়েছেন। আরবে যখন ভণ্ডনবীদের উদ্ভব হয় তখন তিনি দারুল খিলাফত রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর তিনি উমর (রা)-এর আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে উমর (রা)-এর সাথে বিবাহ দিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি সর্বদা উমর (রা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। উসমান (রা)-এর নির্বাচনকালে তিনি তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন এবং উসমান (রা)-এর বাসভবন শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হলে তিনি তাঁর পুত্র হাসান ও হুসাইনকে তাঁর পাহারার নিযুক্ত করেছিলেন।

খলিফা নির্বাচন

হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর তিন দিন পর্যন্ত খিলাফতের মসনদ খালি ছিল। মদীনাতে বিরাজমান ছিল অস্বস্তি ও অশান্ত পরিবেশ। সর্বত্র বিদ্রোহীদের আনাগোনা। এদিকে খলিফা নির্বাচনের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র আলী (রা)-ই ছিলেন যাকে খলিফা নির্বাচনে সকলে একমত হতে পারে। মুহাজের ও আনসারদের মধ্যে তালহা ও যুবায়ের- ছিলেন। তাঁরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন এ মুহূর্তে প্রধান জরুরী কাজ হল খলিফা নির্বাচন। হযরত আলী (রা) এ কথার ইঙ্গিত অনুভব করে বলতে লাগলেন, আমার এর প্রয়োজন নেই। আপনারা যাকে খুশি খলিফা নির্বাচন করুন আমিও তাঁকে মেনে নেব। উভয়ে আরজ করলেন আপনার বর্তমানে কেউ এ কাজের অধিকারী নয়। সুতরাং আপনাকে ছাড়া আমরা অন্য কাউকে খলিফা নির্বাচন করব না। হযরত আলী (রা) পুনরায় নিজের অমত ব্যক্ত করলেন এবং বললেন আমীর হওয়ার চাইতে উজীর হওয়াটাই আমার পছন্দ। অবশেষে অন্যান্য সাহাবাগণ এসে পুনর্বার তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে, আমরা একমাত্র আপনার হাতেই 'বাইয়াত' করব। মুসলিম জনগণের অনেক পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে এবং মুসলিম মিল্লাতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ করে তিনি পরিশেষে সম্মত হলেন। ২১ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি সোমবার তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের বাইয়াত হয়। এ বাইয়াতে মদীনার বিশিষ্ট সাহাবীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাইয়াতের পর তিনি খিলাফতের আসনে সমাসীন হন।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) হযরতের নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর আগে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে বানু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুটি ডাক নাম ছির আবু তোরাব ও আবুল হাসান। হযরত মুহাম্মাদের (স) চাচা আবু তালিব ছিলেন হযরত আলীর (রা) পিতা। শৈশবে তিনি রাসূলের কাছে লালিত-পালিত হন। হযরত আলী (রা) বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ মেধা ও শক্তি দিয়ে আজীবন ইসলামের সেবা করেছেন। মহানবী (স) হিজরাতের রাতে তিনি তাঁর বিছানায় শায়িত ছিলেন। হযরত আলী (রা) ২৪ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর কন্যা বিবি ফাতিমাকে বিয়ে করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন। এজন্য তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ' বলা হয়। রাসূলের ইনতিকালের পর খোলাফায়ে রাশিদীনের পূর্ববর্তী তিন খলিফার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও সহযোগিতা ছিল সীমাহীন। তিনি সকলেরই উচ্চ পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর সকলের অনুরোধে তিনি খলিফার পদ গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১৩

মিল করুন

১. চতুর্থ খলিফা	১. আবু তালিব
২. রাসূলের নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে।	২. হযরত আলী (রা) পুত্র
৩. হযরত আলী (রা)-এর পিতা।	৩. হযরত আলীর দুটি ডাক নাম।
৪. হাসান ও হুসাইন	৪. হযরত আলী (রা)।
৫. আবু তোরাব ও আবুল হাসান	৫. হযরত আলী (রা)।
৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির লেখক ছিলেন।	৬. হযরত উসমানের (রা)।
৭. কার ইনতিকালের পর তিন দিন খিলাফতের মসনদ খালি ছিল।	৭. হযরত আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলীর পরিচয় ও প্রশাসনিক জীবনের বর্ণনা দিন।
২. ইসলামের সেবার হযরত আলীর (রা) ভূমিকা কি ছিল?
৩. তিনি কিভাবে খলিফা নির্বাচিত হন?

পাঠ ১৪ হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে গৃহযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলীর (রা) খিলাফতের অসুবিধাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন
- তাঁর সময় সংঘটিত গৃহযুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারবেন
- গৃহযুদ্ধের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি

খলিফা হয়ে হযরত আলী (রা) অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হন। উসমান (রা) হত্যার জের ধরে তখনও বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করছিল। চারদিক থেকে উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উঠে। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়ে উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অনুসন্ধান করে বের করা এবং তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা।

সুতরাং হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা) এবং আরও কতিপয় সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর কাছে দাবি জানালেন যে, উসমান হত্যার সাথে যে দলটি জড়িত তাদের থেকে কেসাস বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা আবশ্যক। তিনি বললেন, তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত নই। কিন্তু এমন একটি দলের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি যাদের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই।

আমীরে মুয়াবিয়ার পদচ্যুতি এবং তাঁর বিদ্রোহ

হযরত আলী (রা)-এর জন্য সত্যই এটা একটি কঠিন সময় ছিল যে, তাঁর কোন কোন রাজনৈতিক সমর্থকদের কারণে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। হযরত আলী (রা) হত্যার ঘটনাটি পরীক্ষা ও তদন্তের পর্যায়ে রেখে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার দিকে মনোনিবেশ করেন। উসমানের সময়কার কয়েকজন বিশেষ শাসকের কারণে দেশে গোলযোগ চলছিল। এ জন্য তিনি হযরত উমরের নীতি অনুসরণ করে কয়েকজন গভর্নরকে অপসারণের আদেশ জারি করেন। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস, মুগীরা (রা) এবং অন্যান্যরা বলেছিলেন, এখন একাজ করা রাজনীতি ও পরিণামদর্শিতার দিক হতে ঠিক হবে না। এরাই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাঁড়াবে। হযরত আলী (রা) কারও কথা শোনেনি। তিনি পাঁচ ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্থানের গভর্নর নিযুক্তির আদেশ জারি করেন। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইয়েমেনে, কায়স ইবনে সা'স মিসরে, উসমান ইবনে হানীফ বসরায়, আম্মারাহ ইবনে শিহাব কূফায় এবং সহল ইবনে হানীফকে সিরিয়ায় গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন। ইয়েমেন, মিসর ও বসরায় গভর্নরগণ নিজ নিজ ক্ষমতা দখল করেন। কূফার সাবেক গভর্নর আবু মূসা আশয়ারী হযরত আলী (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সহল তাবুক পর্যন্ত গিয়ে জানেন যে, সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর পদ ছাড়তে এবং হযরত আলী (রা)-কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করে নিতে রাজি নন। বরং তিনি উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প। তিনি হযরত উসমানের রক্তাক্ত জামা এবং নায়েলার কর্তিত আঙ্গুলসমূহ জনগণকে দেখিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদেরকে উত্তেজিত করছিলেন। হাজার হাজার সিরিয়াবাসী হতে শপথ নিয়েছেন যে, উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তারা তলোয়ার কোষবদ্ধ করবে না। সহল ফিরে আসেন এবং হযরত আলী (রা)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

হযরত আলী (রা) বাইআত সম্পর্কে মুয়াবিয়ার সাথে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান শুরু করেন কিন্তু ফল কিছুই হল না। বরং জানতে পারেন মুয়াবিয়া (রা) তাঁর বিরুদ্ধে বিরাট ফৌজ সংগঠন করে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লিপ্ত আছেন। হযরত আলী (রা) ও তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নেতৃত্বে ফৌজ প্রস্তুতির আদেশ দেন। অবশ্য ইমাম হাসান (রা) তখন কেন্দ্র হতে বাইরে গিয়ে কোন গভর্নরের সাথে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেননি।

গৃহবিবাদ

ফৌজ সংগঠনের পর ৩৬ হিজরিতে মদীনায় তখন ইবনে আব্বাসকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে আলী (রা) সিরিয়ার পথে রওয়ানা করেন। কয়েকজন সাহাবা ছাড়া অধিকাংশ মদীনাবাসী তাঁর সাথী হলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন হযরত আয়েশা, তালহা, যুবায়ের (রা)-এর নেতৃত্বাধীন মক্কাবাসীরা তাঁর নিকট হতে পৃথক হয়ে উসমান হত্যার প্রতিশোধ দাবি করছেন। হযরত আলী (রা) মক্কা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধ (জঙ্গে জামাল)

হযরত উসমানের শাহাদাতের পূর্বে হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা এবং হাফছা (রা) হজ্জের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে পথে এসে উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ পান। মারওয়ানসহ কয়েকজন অপসারিত গভর্নর সেখানে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করেন। সম্ভবত মারওয়ান ও অন্যান্যের প্ররোচনায় হযরত আয়েশা প্রমুখ উত্তেজিত হন এবং উসমান হত্যার তাৎক্ষণিক বিচার দাবি করেন। যুবায়ের ও তালহা (রা) তাঁর সাথী হলেন। উম্মে সালমা ও হাফছা (রা) একমত না হতে পেরে মদীনা চলে যান এবং হযরত আলীকে অবস্থা অবগত করান।

হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের দেড় হাজার সৈন্যসহ আলী (রা)–এর মোকাবেলায় রওয়ানা হন। প্রথমত বসরা হতে রসদ ও ফৌজ সংগ্রহ করা ভাল মনে করেন। তিনি ৩৬ হিজরি রবিউল আখের মাসে বসরা পৌছেন। বসরায় আলী কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর (আমেল) উসমান ইবনে হানীফ মোকাবেলা করেন কিন্তু তিনি গ্রেফতার হন। বসরাকে উসমান হত্যার ব্যাপারে জড়িত করা হয়।

এদিকে আলী (রা) রসদ ও ফৌজের সাহায্যের জন্য মক্কার পরিবর্তে বসরা রওয়ানা হন। তিনি যখন কূফা পৌছেন সেখানকার গভর্নর আবু মূসা আশয়ারী হযরত আলী (রা)-এর সাথে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। অবশ্য কাকা ও অন্যান্যের প্রচেষ্টায় নয় হাজার কূফাবাসী হযরত আলী (রা)-এর সাথী হলেন। তাঁর ফৌজ বসরার নিকটবর্তী হলে জানতে পারলেন যে, বসরা পূর্বেই হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফৌজেরা দখল করে নিয়েছে। এজন্য আমীরুল মু'মেনীন যীকারে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে কাকার মধ্যস্থতায় মীমাংসার কথাবার্তা চলতে থাকে। কিন্তু মুনাফিক ইবনে সাবার সমর্থকগণ যারা কপটভাবে আলী (রা)-এর ফৌজের অন্তর্গত ছিল, তারা ঐ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে দেয়নি। তাই উভয় পক্ষ খরিবার নিকটবর্তী ময়দানে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধের ময়দানে আলী (রা)-এর বিভিন্ন কথায় তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাঁরা যুদ্ধ করবেন না। তাঁদের মধ্যে পরস্পর সন্ধির কথা চলল। কিন্তু এ সন্ধি উসমান হত্যার ঘটনার নেপথ্য নায়ক মুনাফিক ইবনে সাবা ও তাঁর অনুসারীদের জন্য এ সন্ধি বিপজ্জনক। তাই তাঁরা রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশার ফৌজের উপর আক্রমণ চালায়। হযরত তালহা, যুবায়ের (রা) বাইরে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, গোলযোগ কিসের? সিপাহীদের পক্ষ হতে বলা হল আলীর ফৌজেরা আক্রমণ করেছে। (উভয়ই) বললেন, আফসোস আলী (রা) মুসলমানদের রক্তারক্তি হতে বিরত হল না! ঐ দিকে হযরত আলী জিজ্ঞাসা করলেন, গোলযোগ কিসের? কয়েকজন সাবায়ী উত্তর দিল, তালহা ও যুবায়েরের সাথীরা আক্রমণ করেছে। হযরত আলী (রা) বললেন, আফসোস! তালহা ও যুবায়ের মুসলমানদের রক্তারক্তি হতে বিরত হল না! উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। হযরত যুবায়ের (রা) যুদ্ধের প্রথমেই রণাঙ্গন ত্যাগ করে বসরার দিকে চলে যান। পথিমধ্যে তাঁকে উমর ইবনে হারমুজান হত্যা করে। হযরত তালহাও এই আত্মঘাতী যুদ্ধ হতে পিছু হটছেন দেখে মারওয়ান তাঁকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। এখন মাঠে একমাত্র হযরত আয়েশা (রা) উটের পিঠে উপবিষ্ট আছেন। উটের রশি ছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হাতে, তিনিও আহত হন। সাত দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। কার ইবনে যুর হযরত আয়েশাকে বললেন, "এটা অন্যায় যুদ্ধ; এখন যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিন।" হযরত আয়েশা যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণার আদেশ দিলেন। ঘোষক যখন ঐ ঘোষণার জন্য এগুচ্ছিলেন জনৈক সাবায়ী তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। যুদ্ধ চলতেই থাকে। হযরত আলী (রা) দেখলেন, হযরত আয়েশার উট বসানো না গেলে যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। তাই তিনি হযরত আয়েশার উটের পা কেটে দেবার আদেশ দেন। তাই করা হল কিন্তু আমীরুল মুমেনীনের অনুসারীগণ সসম্মানে উম্মুল মুমেনীনের গদি তুলে নিলেন, তাঁর শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। এ যুদ্ধে দশ হাজারের মত মুসলমানের প্রাণহানি ঘটে। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) ঘোষণা করেন, পলায়নপর কারও উপর আক্রমণ করবে না। কোন আহতকে হত্যা করবে না, কাউকে গ্রেফতার ও করবে না, কারও কোন জিনিস ছিনতাই করবে না। কারও সম্পদ লুট করবে না। অস্ত্র সংবরণকারী এবং গৃহের দরজা বন্ধকারীরা নিরাপদ। এ ঘোষণার সাথে সাথে হযরত আলী (রা)-এর সৈন্যরা যুদ্ধবিরতি করল।

আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হযরত আলী (রা)

যুদ্ধবিরতির পরপরই হযরত আলী (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন গিয়ে দেখেন উম্মুল মুমেনীন কোন প্রকার আহত হয়েছেন কিনা? আর তাঁকে নিয়ে যেন আবদুল্লাহ বিন খালফ খাজায়ীর বাসগৃহে অবস্থান করেন। এখানে খলিফা তাঁর সাথে দেখা করেন এবং ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

কিছুদিন হযরত আয়েশা বিশ্রাম গ্রহণের পর হযরত আলী (রা) মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হুকুম দিলেন, সম্মানের সাথে তাঁকে যেন মক্কা শরীফে পৌছে দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে সওয়ারী, পথ খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীও তাঁর খেদমতে এনে হাজির করা হল। হযরত আয়েশা (রা)-এর যেসব সাথী যেতে চাইলেন, তাঁদেরকেও যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল। সম্মানিত মহিলাদের সাথে দেয়া হল বসরার পুলিশ দলকে। বিদায়ের প্রাক্কালে আমীরুল মুমেনীন খোদ উপস্থিত থেকে তাঁকে কিছুদূর পথ এগিয়ে দিয়ে আসলেন।

বিদায়কালে হযরত আয়েশা (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমার সন্তানেরা' সম্পূর্ণ এক ভুল বুঝাবুঝির ওপর ভিত্তি করে মূলত এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং এখন আমাদের একের ওপর অপরের যুলুম করা ও প্রতিশোধ নেয়া ঠিক হবে না। আমার এবং আলী (রা)-এর মধ্যে যা ঘটেছে তা সাধারণত শাশুড়ি জামাতার মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয় সেরূপ একটি। তাছাড়া অন্য কোন প্রকার বিদ্বেষ ছিল না। সর্বোপরি এখনও তিনি আমার নিকট অন্যতম মহৎ ব্যক্তিত্ব।

উম্মুল মুমেনীনের এ ভাষণের পর হযরত আলী (রা) বললেন, উম্মুল মুমেনীন যথার্থই বলেছেন। আল্লাহর কসম, তাঁর এবং আমার মধ্যে এ ছাড়া মর্ম বেদনার আর কিছুই ছিল না। তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় স্থানেই মহানবী (স)-এর সম্মানিত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ সন্তোষজনক ও খোলামেলা আলোচনার পরই একে অপরের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে হাসান এবং হুসাইনকে প্রেরণ করলেন।

ফলাফল

উষ্ট্রের যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানের প্রথম শক্তি পরীক্ষা। ইসলামের ইতিহাসে এটাই মুসলমানের মধ্যে প্রথম ব্যাপক গৃহযুদ্ধের সূচনা করেছিল। এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিলেন। এ যুদ্ধের ফলেই মুসলমানদের মধ্যে যে গোত্রীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তা মুসলমানদের জন্য খুব মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "মুসলমানগণ পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার দৃষ্টান্ত উষ্ট্রের যুদ্ধে প্রথম সূত্রপাত হয়। আত্মঘাতি যুদ্ধের এটাই শেষ নয়-আরম্ভ মাত্র। এরূপ রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল।

প্রশাসনিক পরিবর্তন

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। কায়েস বিন সাদকে মিসরে, সাহল বিন হানীফকে হিজাজে এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটন করাই ছিল এ প্রশাসনিক পরিবর্তনের মূল লক্ষ।

রাজধানী স্থানান্তর

এ সময় হযরত আলী (রা) ইরাকীদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং কূফা সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় মদীনা হতে কূফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (৬৫৭ খ্রি)। তাঁর ধারণা ছিল যে, সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অশান্ত বেদুঈনদেরকে বশে রাখতে রাজধানী হিসেবে কূফা অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাজধানী স্থানান্তর তাঁর জন্য শুভ হয়নি। এটা তাঁর অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এ পরিবর্তন কূফার অশান্ত ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন জনতার ওপর হযরত আলীর নির্ভরতা অধিকতর বেড়ে গিয়েছিল এবং পরে কূফাবাসীরাই হযরত আলী (রা)-এর পতনের জন্য অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মদীনার গুরুত্ব লোপ

এ সময় হতে কূফা ও বসরার প্রাধান্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে মদীনার গুরুত্বও কমে যায়। এতে জীবিত সাহাবাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এবং খলিফা হযরত আলী (রা) মদীনাবাসীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন।

সার-সংক্ষেপ

খিলাফত গ্রহণ করার পর হযরত আলী (রা) নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। রাষ্ট্রে নানা রকম অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। এমন সময়ে হযরত উসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উঠে তিনি সাম্রাজ্যে প্রথমে শান্তিও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে হযরত তালহা, যুবায়ের, বিবি আয়েশা, মুয়াবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, খিলাফত গ্রহণের পর হযরত আলী (রা) দুর্নীতি পরায়ণ শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করেন। উমাইয়াগণ কর্তৃক যে সমস্ত সম্পত্তি ও জায়গার অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিল তা রাজ্য সরকার ফেরত দেওয়ার নির্দেশন দেন। হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমি-নীতি পুনপ্রবর্তন করেন। এতে উমাইয়াগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এভাবে হযরত উসমানের হত্যাকে কেন্দ্র করে যে বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় তার ফলে রাজ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ গৃহযুদ্ধের মধ্যে ভয়াবহ ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ- তার নেতৃত্বে ছিলেন বিবি আয়েশা (রা) সহ হযরত তালহা ও যুবায়ের। সিফফিনের যুদ্ধ যার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মুয়াবিয়া, ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ। এ সব যুদ্ধের ফলে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তাতে রাজ্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১৪

এক কথায় উত্তর দিন-

১. হযরত আলী (রা) এর ক্ষমতা গ্রহণের পর সবচেয়ে কোন দাবিটি জোরালো ভাবে উঠানো হয়?
২. কোন গভর্নর হযরত আলীকে (রা) খলিফা বলে স্বীকার এবং নিজের পদ ছাড়তে রাজী ছিলেন না?
৩. উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বিপরীতে বড় বড় কোন কোন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন?
৪. যুদ্ধের শেষে জনগণের উদ্দেশ্যে হযরত আয়েশার (রা) বক্তব্য কি ছিল?
৫. মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক গৃহ বিবাদ কোনটি?
৬. হযরত আলী (রা) মদীনাবাসী সাহাবীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা থেকে কেন বঞ্চিত হন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধের দাবিটি কি ছিল? এ ব্যাপারে হযরত আলীর (রা) ভূমিকা কেমন ছিল?
২. হযরত মুয়াবিয়ার পদচ্যুতি ও তাঁর বিদ্রোহ সম্পর্কে বর্ণনা দিন?
৩. উষ্ট্রের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ফলাফল লিখুন।

পাঠ ১৫ হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন
- সিফ্ফিনের যুদ্ধের ঘটনা বলতে পারবেন
- দ্বন্দ্বের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইসলামের ইতিহাসের অতীব দুঃখজনক অধ্যায়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর রাজত্বকালের রাজনৈতিক কোন্দল, স্বার্থসংঘাত, গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিণামে হযরত উসমানের শাহাদাত, বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা এবং দলীয় বিদ্বেষ সর্বোপরি পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির আবর্তে পড়েই হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। যার পরিণামে ইসলামের ঐতিহ্যে নেমে আসে ধ্বংস। খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত- নবুওয়াতের পদাঙ্কানুসারে যে খিলাফত চলার কথা তা ক্রমে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হওয়ার মঞ্চ তৈরি হতে থাকে। হযরত আলীর (রা) পাঁচ বছরের খিলাফাতকাল ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিত্রিত। ঐতিহাসিক ভনক্রেমার দুঃখ করে বলেন, "যদি হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটত তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আরও প্রীতিকর, সুখকর এবং সম্ভবত অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হত।"

দ্বন্দ্বের কারণসমূহ

হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের যে সকল কারণ ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে ঃ

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ব্যাপক রদবদলের আদেশ ঃ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপনের লক্ষে হযরত আলী উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদত্যাগের নির্দেশ প্রদান করেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসকগণ আলীর নির্দেশ মেনে নিলেও মুয়াবিয়া তা মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্যও স্বীকার করেননি। ফলে আলী-মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

মুয়াবিয়ার উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা দখলের বাসনা ঃ উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া ছিলেন একজন উঁচুমানের সংগঠক, বিজেতা ও শাসক। সিরিয়ায় তিনি নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধি তাঁর ক্ষমতা লি□/ ও উচ্চাভিলাষকে অধিকতর জাগ্রত করেছিল। মুয়াবিয়া হযরত উসমান হত্যার রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করে আলীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেন এবং সিরিয়ার সমগ্র জনতাকে স্বীয় পতাকাতলে সমবেত করেন।

ভূমি ও রাজস্বনীতির পরিবর্তন ঃ হযরত আলী (রা) ভূমি ও রাজস্বনীতির পরিবর্তন সাধন করে অন্যায়ভাবে দখলকৃত সকল জমি সরকারকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে উমাইয়াদের বিশেষত মুয়াবিয়ার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

উমাইয়া ও হাশেমী বিরোধ ঃ আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল উমাইয়া-হাশেমী বিরোধ। মুআবিয়া ছিলেন উমাইয়া এবং আলী ছিলেন হাশেমী গোত্রের। উসমানের সময় উমাইয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য হাশেমীগণ যেমন তৎপর ছিল, হাশেমী বংশীয় আলী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে উমাইয়াগণও তেমনি এর ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়।

উসমান হত্যার বিচার দাবি ঃ উসমানের (রা) সমর্থক জনসাধারণ বিশেষত মুয়াবিয়া তাৎক্ষণিকভাবে উসমান হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু নাজুক পরিস্থিতির কারণে আলীর পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে উসমান হত্যাকারীদের বিচার করা সম্ভব ছিল না। মু'য়াবিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করে অপপ্রচার করেন যে, আলী নিজেও উসমান হত্যার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন এবং এজন্য তিনি হত্যাকারীদের বিচার করছেন না।"

হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়াকে ধৈর্য ধারণ করতে পরামর্শ দেন। তিনি উদ্ভুত উত্তেজনাময় পরিস্থিতির অবসান হলে বিচারের আশ্বাস দেন। কিন্তু মুয়াবিয়া তাৎক্ষণিক বিচারের দাবি করে খলিফার বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কার্যক্রম চালাতে থাকেন। অবশেষে হযরত আলী তার অবাধ্যতার অবসানকল্পে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেন। মুয়াবিয়া আলী (রা)-এর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাখ্যান করে হযরত আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেন। তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রা)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ঃ উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হলে হযরত আলী সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাবসহ মুয়াবিয়ার নিকট পত্র পাঠান। আমীর মুয়াবিয়া এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হযরত আমর ইবনুল আসের সাথে পরামর্শ ক্রমে হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সিফফিনের যুদ্ধ ঃ মুয়াবিয়ার অবাধ্যতার ফলে হযরত আলী ৫০ হাজার সৈন্যসহ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে (৩৬ হিজরি জিলহজ্জ মাসে) সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মুয়াবিয়া ৬০ হাজার সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরের সিফফিন নামক স্থানে উপস্থিত হলেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, যুদ্ধ শুরু হবার আগে হযরত আলী মুয়াবিয়ার নিকট অযথা যুদ্ধ ছেড়ে ইসলামের স্বার্থে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে প্রতিনিধি পাঠান। কিন্তু উদ্ধত স্বরে মুআবিয়া জবাব দেন- আমার নিকট থেকে চলে যাও, আমার এবং তোমাদের মধ্যে তরবারি ব্যতীত কিছুই নেই। অবশেষে যুদ্ধ শুরু হল।

যুদ্ধের সূচনায় অযথা লোকক্ষয়ের পরিবর্তে হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়াকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। কিন্তু চালাক মু'য়াবিয়া আল্লাহর বাঘ আলী (শের-ই-খোদা)-এর সাথে যুদ্ধ করে অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজী হলেন না। অবশেষে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন মু'য়াবিয়া বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হল।

মুয়াবিয়ার কৌশল অবলম্বন ঃ অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এড়াবার জন্য মুয়াবিয়া এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর বর্শা ও পতাকার সাথে কুরআন ঝুলিয়ে দেয়া হলো, অতঃপর মু'য়াবিয়া বাহিনী চিৎকার করে বলতে লাগল "এ কুরআনই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে।" মুয়াবিয়া বাহিনীর এ কাজে হযরত আলী (রা)-এর আল্লাহ ভীরু সৈনিকরা কুরআনের সম্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করলেন। হযরত আলী তাদের চক্রান্তকে অনুধাবন করতে পারলেও তার বাহিনীর লোকের চাপে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হলেন।

দুমাতুল জান্দালের মীমাংসা ঃ যুদ্ধ বিরতির পর দুমাতুল জান্দালে উভয় বাহিনীর মিমাংসা বৈঠক হয়। মীমাংসায় হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মূসা আশয়ারী ও মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আস নেতৃত্ব দেন। মীমাংসায় স্থির হয় যে, উভয় প্রতিনিধি ঘোষণা করবে যে, আলী অথবা মুয়াবিয়া (রা)-এর কেউই খলিফা হতে পারবে না। অতঃপর আমর ইবনুল আসের চক্রান্তে মূসা আশয়ারী প্রথমে ঘোষণা দেন যে, হযরত আলী খলিফা থাকতে পারবেন না, বরং অন্য একজন খলিফা হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমর ইবনুল আস এ সুযোগ গ্রহণ করে ঘোষণা করেন হযরত মুয়াবিয়াই হবেন ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা।

এভাবে দুমাতুল জান্দালের প্রহসনমূলক সালিস সমাপ্ত হয়। দুমাতুল জান্দালের প্রহসনমূলক মীমাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল তার দল ত্যাগ করে। তারা ঘোষণা করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও মীমাংসার অধিকার নেই। তারা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত ঘটনার জন্য হযরত আলী, আমর ইবনুল আস ও মুয়াবিয়াকে দায়ী করে। তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের শান্তির অন্তরায় ব্যক্তি ত্রয়কে নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক খারিজীদের তিন জন ঘাতক কূফা, দামেশক ও অপর জন ফুস্তাতে প্রেরণ করে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে আমর মসজিদে হাজির হননি, আর মু'য়াবিয়া সামান্য আহত হলেও রক্ষা পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত আলী মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হন। আবদুর রহমান ইবন মুলজামের অব্যর্থ ছুরিকাঘাতে তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি (১৭ রমযান ৪০ হিজরি) শাহাদাত বরণ করেন।

ফলাফল

খিলাফতের মর্যাদা লোপ ঃ আলী ও মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। দুমার মীমাংসা গ্রহণ করার ফলে খলিফাকে নানা প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এর পূর্বে মুয়াবিয়া একজন ন্যায়সঙ্গত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গভর্নর ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মিসর ও সিরিয়ার যাবতীয় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মুয়াবিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে হযরত আলী তাঁর সাথে সন্ধির মাধ্যমে খিলাফতকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এতে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খলিফার উপর এবং খিলাফতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোপ পেতে থাকে। এটা খিলাফতের মর্যাদা বিনষ্ট করে। শুধু তাই নয়, খলিফার জীবদ্দশাতেই মুসলিম সাম্রাজ্য দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়।

চরমপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঃ সিফফিনের যুদ্ধ, দুমাতুল জান্দালের শঠতা, হযরত আলী (রা)-এর নমনীয় নীতি ইত্যাদির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মধ্যে একদল চরমপন্থী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা খারিজী ও শিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এদের নাশকতামূলক কার্যক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

মুআবিয়ার ক্ষমতা সুসংহত ঃ হযরত আলী-মুআবিয়া দ্বন্দ্বের ফলে মুয়াবিয়ার ক্ষমতা সুসংহত হয়। হযরত আলী নানাদিক দিয়ে সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন। এসব দুর্বলতার সুযোগে দূরদর্শী মুআবিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন।

হযরত আলীর (রা) শাহাদাত ঃ হযরত আলী মুয়াবিয়ার সংঘাতের নির্মম বলি হিসেবে হযরত আলীকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। বিদ্রোহী খারিজীরা হযরত আলী (রা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খারিজী সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবন মুলজাম কর্তৃক ছুরিকাঘাতে হযরত আলী (রা) শহীদ হন।

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর ক্ষমতার চাবিকাঠি কব্জা করেন আমীরে মুয়াবিয়া। ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের খিলাফত বিলুপ্ত হল, সূচনা হল রাজতন্ত্রের। খিলাফতের স্থান দখল করল রাজতান্ত্রিক বংশধারা (উটহভর্ত্রধঞ্র)।

সুদূর প্রসারী তাৎপর্য ঃ আলী ও মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও তাৎপর্যবহ। বিশেষত সংঘর্ষের পরবর্তীকালে আলীর সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পেলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর মিসর দখল করে নেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র হাসানের পরাজয় এবং নৃশংস কারবালার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সামগ্রিক ফল মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না।

খিলাফত লাভের জন্য গৃহযুদ্ধ ঃ আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর ইসলামের খিলাফত অধিকারের ব্যাপারে অনেক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ গৃহযুদ্ধ উমাইয়া বংশীয় খলিফা আব্দুল মালেকের খিলাফত (৬৮৫-৭০৫ খ্রিঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত অন্তর্বিরোধের ঘূর্ণিপাকে মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি ও সংঘবদ্ধতা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

অধিকতর মুসলিম সাফল্যের অন্তরায় ঃ আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যদি এ গৃহযুদ্ধ না ঘটত তা হলে মুসলমানগণ অনেক কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে মুসলিম উম্মার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারত।

আলী (রা)-এর অসফলতার কারণ

তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর মৃত্যুতে আলী (রা)-এর ক্ষতি ঃ এক সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তালহা, যুবায়ের ও হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে আলী (রা)-কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তালহা ও যুবায়ের হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীগণ কর্তৃক নিহত হলেন। তাঁদের মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত মুয়াবিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং হযরত আলী (রা)–এর পক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঃ হযরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার এটাও একটা কারণ যে, রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশেষভাবে তখন বসরা, মিসর ও পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সকল প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে হযরত আলী (রা)-এর শাসনকার্যে গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি হয়। মিসরের পরাজয় তাঁর সম্মানের ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল।

মু'য়াবিয়ার সমর্থকদের শক্তি বৃদ্ধি ঃ মুয়াবিয়া সিরিয়াবাসীর ওপর নির্ভর করতেন এবং তারা তাঁর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিল; কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর নির্ভরস্থল কূফার অধিবাসী ছিল অস্থির চিত্তের অধিকারী। বিপদের সময় তারা তাঁর পাশে দণ্ডায়মান হয়নি। তাছাড়া খলিফার সেনাবাহিনীতে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অবস্থিতি ও সিফফিনের যুদ্ধকালে খারেজীদের দলত্যাগ ও দেশবাসীর ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা হযরত আলী (রা)-এর পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

উমাইয়া ও হাশেমীয়দের মধ্যে বিরোধ ঃ উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে বংশগত সংঘাত হযরত আলীকে কম বিব্রত করেনি। সময়টাও মুয়াবিয়ার অনুকূলে ছিল। কারণ তখন প্রথমোক্ত দলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষোক্ত দল দুর্বল হতে থাকে।

আলী (রা)-এর দুরদর্শিতার অভাব ঃ হযরত আলী (রা) নিজেও তাঁর ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তিনি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বটে; কিন্তু যোগ্য সংগঠক ও দূরদর্শী রাজনৈতিক ছিলেন না। সমঝোতা ও আপসের মাধ্যমে তিনি সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে শাসনকর্তাদের রদবদল তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমর বিন আসের কূটনীতি এবং মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হযরত আলী (রা)-এর ব্যর্থতার বিশেষ কারণ ছিল।

সার-সংক্ষেপ

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর সংঘাতময় পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে হযরত আলী শপথ গ্রহণ করেন। খলিফা হয়েই তিনি ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শেষাবধি হযরত মু'য়াবিয়ার সাথে সিফফিন প্রান্তরে তাঁর চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। মুয়াবিয়াকে দমন করার জন্য হযরত আলী ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। সংবাদ পেয়ে মুয়াবিয়াও ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে বিখ্যাত সিফফীনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই সিফফিনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত হলে মুআবিয়ার সেনাপতি আমরের পরামর্শে সৈন্যগণ বর্শা ও পতাকাদণ্ড শীর্ষে কুরআন শরীফ বেঁধে। এতে আলী পক্ষের বিপুল সংখ্যক সৈনিক হযরত আলীকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ফলে যুদ্ধ জয়ের মুখে হযরত আলী যুদ্ধ থামিয়ে দেন। অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে জন্দলে বিচার মজলিশ শুরু হয়। কিন্তু সালিসীর রায়ে আলীর পদচ্যুতি এবং তদস্থলে মুয়াবিয়ার মনোনয়নের কথা সুকৌশলে ঘোষিত হলে পুরো ব্যাপারটি প্রতারণায় পর্যবসিত হয়। এতে মুআবিয়ার কূটনৈতিক জয় হয় এবং আলী রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দুমাতুল জন্দলের বিচার ন্যায়সঙ্গত হয়নি। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের ফলে ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। ইসলামি খিলাফত তার ঐতিহ্য হারিয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের নিগড়ে আটকে পড়ে। ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সুচনা হয়। খলিফাতুল মুসলিমীন-এর পদ বাদশাহীতে রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত আলী (রা) কর্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদত্যাগের নির্দেশ মেনে নেয়নি-
   ক. সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)
   খ. কুফার গভর্নর আবু মূসা আশয়ারী (রা)
   গ. মিসরের গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)
   ঘ. ইয়ামেনের ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)

২. হরত উসমানের রক্তমাখা জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল দেখিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন-
   ক. হযরত আয়িশা (রা) খ. হযরত তালহা (রা)
   গ. হযরত যুবাইর (রা) ঘ. হযরত মুআবিয়া

৩. হযরত আলী কর্তৃক কয়েকজন অপসারিত গভর্নরদের মধ্যে কে হযরত আয়েশা (রা) কে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন-
   ক. মুআবিয়া খ. মারওয়ান
   গ. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ঘ. তালহা

৪. উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেন?
   ক. হযরত মুআবিয়া তালহা খ. হযরত আয়েশা তালহা ও যুবায়ের
   গ. হযরত আবু মূসা আশয়ারী ও কা'কা ঘ. মারওয়ান, মুয়াবিয়া ও যুবায়ের

৫. হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন-
   ক. ইরাকে খ. বাগদাদে
   গ. কূফায় ঘ. দামেশকে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করুন
২. সিফফিনের যুদ্ধের বিবরণ দিন।
৩. গৃহযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করুন।

হযরত আলী (রা)-এর কৃতিত্ব ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা) কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবেন
- হযরত আলীর (র) শাসন সংস্কারের বিষয়ে বলতে পারবেন
- হযরত আলীর (র) চরিত্রের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

হযরত আলী মুর্তাযা (রা) খোলাফায়ে রাশিদীনের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। বিপুল তারুণ্য নিয়ে তাঁর ইসলামে আগমন আর সারা জীবনব্যাপী ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ হযরত উসমানের শাসনের শেষের দিকে উমাইয়াদের যে প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আলী (রা) পুনরায় তাকে সঠিকভাবে ঢেলে সাজান এবং প্রশাসনিক সংস্কার করেন। হযরত উসমান (রা)-এর যুগে অসাধু আমলাদের কারণে প্রশাসনে যেসব দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল সেগুলো দূর করে তিনি হযরত উমরের যুগের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন এবং তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। নাজরানের ইহুদিদেরকে উমর (রা) হিজায থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তারা পুনরায় হিজাযে আগমনের দরখাস্ত করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সামরিক বাহিনী ঃ হযরত আলী (রা) স্বভাবগতভাবে ছিলেন একজন যোদ্ধা এবং সমরনায়ক। তাই সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। উপর্যুপরী যুদ্ধের কারণে যদিও তিনি সামরিক ব্যবস্থায় বেশি উন্নতি সাধনের সুযোগ পাননি তবুও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেনা-ছাউনি নির্মাণ করেছেন।

অর্থ বিভাগ ঃ তিনি অর্থ বিভাগে এমন কিছু সংস্কার সাধন করেন যার ফলে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আগে দেশের বন এলাকা থেকে কোন অর্থ আসত না, তিনি সেগুলোকে আমদানিযোগ্য করে তোলেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে করও রহিত করেন।

প্রাদেশিক গভর্নরদের খবরদারী ঃ উমরের (রা) শাসনামলের ন্যায় তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের চারিত্রিক অবস্থার প্রতি কড়া নজর রাখতেন। আঞ্চলিক শাসকদের কার্যাবলী তদারকী করতেন। তাদের সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা ও খবরদারী করতেন। ভ্রান্ত নীতিসমূহ সংশোধন করতেন।

বায়তুল মালের সংরক্ষণ ঃ বায়তুল মালের যথাযথ সংরক্ষণে তিনি সতর্ক ছিলেন। নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের কাজে সরকারি কোষাগারের সাধারণ কোন জিনিসও তিনি ব্যয় হতে দিতেন না। মহানবী (স)-এর ভৃত্য আবু রাফেকে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করেছিলেন।

জিম্মীদের সাথে ব্যবহার ঃ জিম্মীদের অধিকারের প্রতি হযরত আলী (রা) বিশেষ লক্ষ রাখতেন। তাদের প্রতি সদয় হবার ও সদাচরণ প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের প্রতি নির্দেশ দিতেন।

সাম্য ও ন্যায়বিচার ঃ আলী (রা)-এর দরবারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান ব্যবহার পেতেন। কোন প্রকার বৈষম্য এখানে প্রশ্রয় পেত না। এমনকি কোন মোকদ্দমায় যদি খোদ খলিফা আলী বিবাদী হতেন, তিনি বিচারকের দরবারে সাধারণ লোকের ন্যায় গিয়ে হাজির হতেন। খলিফা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগের আইন-গ্রাহ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে যদিও আদালতের রায় তাঁর বিরুদ্ধে যেত, তাও তিনি বিনাবাক্যে মেনে নিতেন।

বাজার দর পরিদর্শন ঃ পণ্যসামগ্রীর বাজারের দর তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতেন। যেন তা সাধারণ মানুষের বাইরে চলে না যায়। দোকানদারদেরকে সঠিক মাপ ও ক্রেতার সাথে ভাল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন।

হযরত আলী (রা)-এর চরিত্র

হযরত আলী (রা) শৈশবকাল থেকেই মহানবী (স)-এর তত্ত্বাবধান ও সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি যাবতীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। যৌবনে হযরত (স)-এর জামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর

মধ্যে জ্ঞান আহরণ এবং বহুমুখী জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের সহজাত যোগ্যতা ও আগ্রহ ছিল। এ কারণে নবীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কুরআন মজীদ, তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ, অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানে তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সকলেই একমত ছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর বাণী "আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার ফটক" এরই প্রমাণ দেয়। আল্লাহর কালামের সাথে ছিল তাঁর বিশেষ সংযোগ। তিনি ছিলেন কুরআন মজীদের হাফেয। কুরআন মজীদের শিক্ষা পেয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহর পবিত্র মুখ থেকে। কুরআনের মর্মবাণী এবং তা থেকে ব্যবহারিক জীবনের নিয়ম-বিধির উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন বিশেষ মেধা শক্তির অধিকারী। মহানবী (স)-এর ওফাতের পর তিনি কুরআন মজীদের আয়াত এবং সূরা সমূহের নাযিলের দিক হতে বিন্যস্ত করেন।

এসব জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে বিষয়বস্তুর গভীর মর্মার্থ উদ্ভাবনে স্বভাবগত সতর্কতা, সূক্ষ্মদর্শিতা এবং তাৎপর্য অনুধাবনের বিশেষ প্রজ্ঞাশক্তি নিহিত ছিল। শরীয়তের মূল নীতিমালা থেকে বিভিন্ন ধারা-উপধারা ও শাখা-বিধানসমূহ উদ্ভাবনে তিনি বিশেষ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফিকাহর বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েলেও তাঁর গভীর জ্ঞানের অনেক দৃষ্টান্ত মিলে।

উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম বড় পণ্ডিত। বিভিন্ন ধরনের মামলা-মোকদ্দমাতে তাঁর প্রদত্ত রায়সমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল উৎস হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বকেই গণ্য করা হয়।

পাণ্ডিত্য ঃ হযরত আলী (রা) ছিলেন আরবের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা ও অলংকারিক দিক থেকে আরবি সাহিত্য উচ্চমান সম্পন্ন। তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের আকর্ষণীয় নিদর্শন। কাব্যচর্চায় তিনি পরিশীলীত রুচির অধিকারী ছিলেন। 'দিওয়ান-ই আলী' তাঁর সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই মুসলিম বিশ্বে শিক্ষানুরাগী ও কাব্যানুরাগী সকলের কাছে বহুল পরিচিত। সর্বত্রই এ কাব্যগ্রন্থ সমাদৃত।

আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক ঃ আরবি ব্যাকরণের ভিত্তি হযরত আলী (রা)-ই স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজের সাথীদের মধ্য থেকে আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী নামক জনৈক ব্যক্তিকে একাজে নিয়োগ করেছিলেন।

ব্যক্তি চরিত্র ঃ হযরত আলী (রা) স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর জীবন-যাপন প্রণালী ছিল সরল, অনাড়ম্বর। সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি নিজের যাবতীয় কাজকর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করতেন।

ধর্মানুরাগ ও আল্লাহ ভীরুতা ঃ ধর্মানুরাগ, আল্লাহ ভীরুতা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হযরত আলী (রা)-এর চরিত্রের অন্যতম মূলনীতি ছিল। এমন কোন ঘটনা নেই যার মধ্য থেকে তাঁকে এ গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। তাঁর জীবনে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় স্তর-ই বিভিন্ন সময়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু কখনও তিনি বৈষয়িক প্রাচুর্যের প্রতি মুখ তুলে তাকাননি। একটি সাধারণ বাসগৃহ ছাড়া সারাজীবনে তিনি উল্লেখযোগ্য কোন ইমারত নির্মাণ করেননি।

ইবাদাত ও কঠোর সাধনা ঃ ইবাদাত ও কঠোর আত্মিক সাধনা ছিল তাঁর নিয়মিত কাজের অংশ। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) দিনে রোযা, রাতে ইবাদাতে দণ্ডায়মান থাকতেন।

আল্লাহর পথে ব্যয় ঃ কখনও কোন তাঁর দরজা থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়নি। যতক্ষণ তাঁর কাছে দেয়ার মত সামান্য কিছু থাকত তিনি তা দান করে দিতেন। যুদ্ধ, জিহাদে, ইসলাম প্রচারে তাঁর জনবল ও সম্পদ সব কিছুই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে।

বিশ্বস্ততা ও সততা ঃ তিনি ছিলেন জাতির বিশ্বস্ত নেতা। তিনি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে বায়তুল মালের সংরক্ষণ করতেন। নিজের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কোন অর্থ বা খাদ্য বায়তুল মাল থেকে নেয়া হারাম মনে করতেন।

বীরত্ব ও সাহসিকতা ঃ তাঁর জীবন ছিল সরলতা ও সাধুতার এক মূর্ত প্রতীক। খলিফা থাকাবস্থায় একা একা বাজারে ঘুরে বেড়াতেন, পণ্যসামগ্রীর আমদানি-রফতানি ও দর জেনে নিতেন। দিকভ্রান্ত পথিককে পথের সন্ধান দিতেন।

ইসলাম গ্রহণে বীরত্ব ঃ মহানবী (স) তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলে চরম বিরোধিতার মুখে তরুণদের মধ্যে কেবল তিনিই ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে অসীম সাহসের পরিচয় দেন।

হিজরতের রজনীতে বীরত্ব ঃ ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি মহানবী (স)-এর সাথে কুরাইশদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন। হিজরতের ভয়াল রজনীতে শত্রু পরিবেষ্টিত মহানবীর (স) গৃহে তিনি মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মহানবীর (স) বিছানায় শায়িত ছিলেন। পরে গচ্ছিত দ্রব্যাদি মালিকদের নিকট ফেরত দিয়ে মহানবীর (স) নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন।

বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ঃ হযরত আলী ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও সাহসিকতা নিয়ে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মহানবীর (স) জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তিনি প্রায় সব কটিতে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। বদর যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলমানদের নিশানবর্দার। উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনাইন, খায়বর প্রভৃতি যুদ্ধে বীরত্বের তিন্নি তাঁর অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন।

আসাদুল্লাহ উপাধি লাভ ঃ তাঁর সামরিক কৃতিত্বের মধ্যে খায়বরের বিখ্যাত 'কামুস' দুর্গ দখল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে মহানবী (স) আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

যুলফিকার লাভ ঃ মহানবী (স) 'যুলফিকার' নামক তরবারি উপহার দান করে বলেন- 'যুলফিকার' সমতুল্য কোন তরবারী নেই এবং আলীর সাথে কোন বীর যোদ্ধার তুলনা করা যায় না।

অনাড়ম্বর জীবন

হযরত আলী (রা)-এর চরিত্র সরলতা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতায় চিরভাস্বর। তাঁর জীবন যাপন ছিল খুবই অনাড়ম্বরপূর্ণ। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। ধন-সম্পদ বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। এত বড় ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হয়েও তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনও খেয়ে আবার কখনও না খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। তাঁর স্ত্রী নবীনন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে আটা পিষতেন। কোন চাকর-বাকর তাঁর ছিল না। তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী কবি, বৈয়াকরণ, ন্যায় বিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

হযরত আলী (রা) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে মহানবীর চাচা আবু তালিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবীনন্দিনী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা)-এর স্বামী এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় হাসান-হুসাইনের (রা) পিতা। মদীনায় হিজরতের পর ২৫ বছর বয়সে মহানবী (স)-এর দ্বাদশী দুহিতা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করার পর হযরত আলী (রা) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। চারদিকে বিদ্রোহ, উসমান হত্যার বিচারের দাবিসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে জড়িত হতে হয়। মহানবী (স) ও পূর্ববর্তী খলিফাদের আদর্শ অনুসরণ করেই তিনি শাসন ব্যবস্থা চালান। বীরত্বের সাথে সকল সঙ্কট থেকে ইসলামী-রাষ্ট্রের সংহতি বিধান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১৬

এক কথায় উত্তর দিন-

১. খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা কে ছিলেন?
২. প্রশাসনিক সংস্কারে হযরত আলী (রা) কার নীতি অনুসরণ করেন?
৩. বাজারের পণ্য সামগ্রীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য তিনি কি করতেন?
৪. উত্তরাধিকার আইনে মদীনার বড় পণ্ডিত কে ছিলেন?
৫. হযরত আলী (রা) কাব্যগ্রন্থের নাম কি?
৬. আরবী ব্যাকরণের ভিত্তি স্থাপন কে করেন?
৭. হযরত আলীর (রা) চরিত্রের মূলনীতি কি ছিল?
৮. 'আসাদুল্লাহ' অর্থ কি? এটি কার উপাধি ছিল?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলী (রা) কর্তৃক প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. হযরত আলী (রা)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

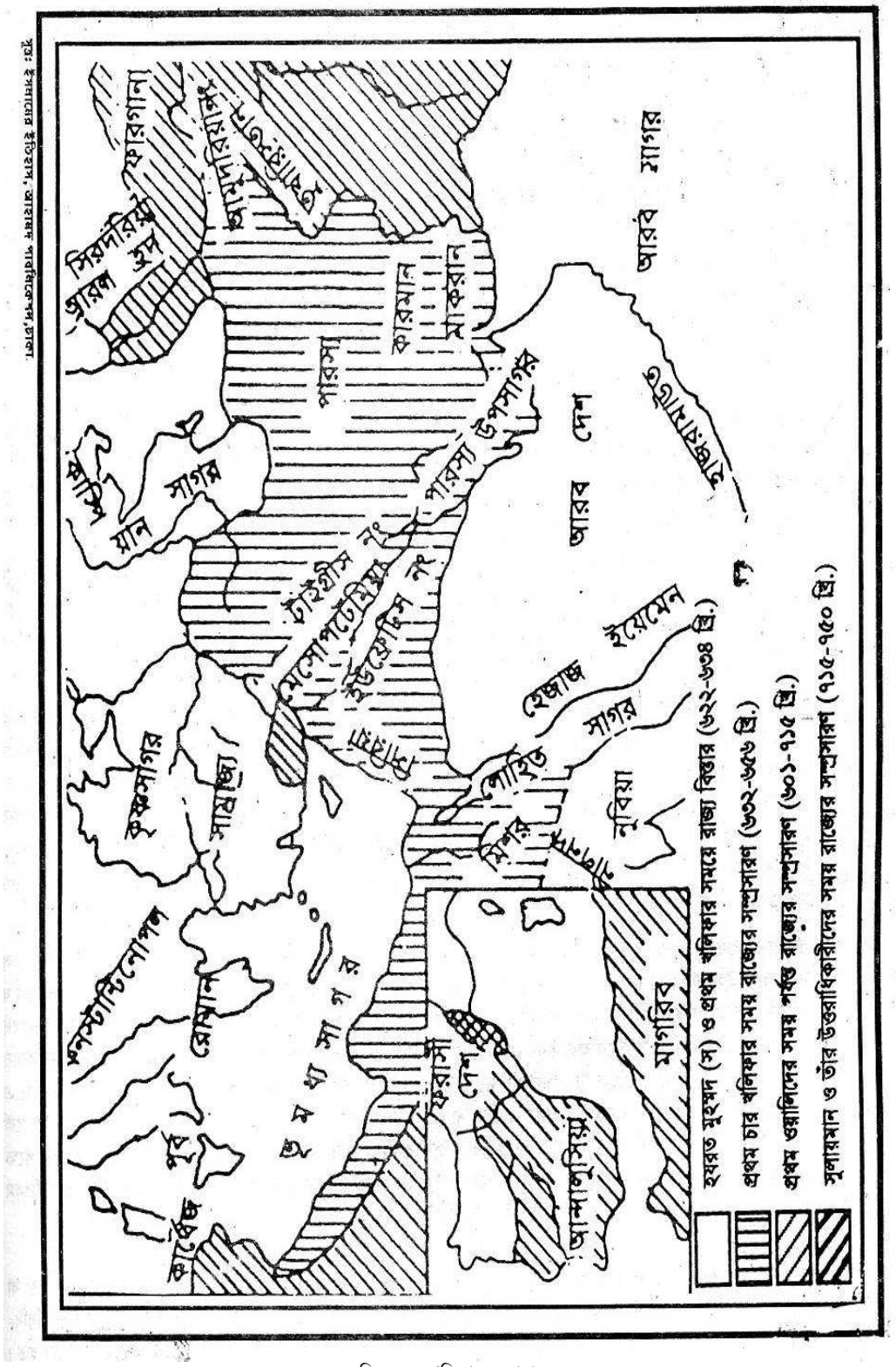

চিত্র-১৮ ঃ খলিফাদের সাম্রাজ্য

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন নীতি বলতে পারবেন

খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি ঃ

খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অবর্তমানে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪জন সাহাবী তাঁর ইনতিকালের পর ৩০ বছর পর্যন্ত তাঁরই আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা)। তাঁরাই ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদীন নামে পরিচিত। তাঁরা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাষ্ট্রের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেছেন বলে তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বা সত্য বা ন্যায়পথগামী বলা হয়ে থাকে।

খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী সভ্যতা ও তামাদ্দুনিক বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সংঘটিত হয়েছিল। এটা ছিল একমাত্র ইসলামি আদর্শভিত্তিক বৈষয়িক উন্নয়নের নিয়ামক রাষ্ট্র। ইসলামের উপরই এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং পবিত্র কুরআনের অকাট্য মূলনীতি ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত অনুযায়ী মানবতার ইহ ও পরলৌকিক সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধানই ছিল এ রাষ্ট্রের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ।

খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূল মোতাবেকই যাবতীয় আইন প্রণয়ন করা হত। খুলাফায়ে রাশেদীন যদি এমন কোন সমস্যার বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতেন, যার প্রত্যক্ষ মীমাংসা কুরআন ও হাদিসে অনুপস্থিত ছিল, তা হলে নবী করীম (স)-এর কার্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে উত্তমভাবে এর মীমাংসা করে নিতেন এবং কোন দিক দিয়েই কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক আদর্শ লঙ্ঘিত হতে দিতেন না।

ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসারে গোটা মুসলিম উম্মাহ খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সে সাথে এ মূলনীতিও সর্বাপেক্ষা সমর্থিত ছিল যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-বিধানের বিরোধিতা করে কোন খলিফা বা রাষ্ট্র কর্তার আনুগত্য করা যেতে পারে না। কুরআন-হাদিসের মূলসূত্র হতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে খলিফার প্রাধান্য বা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে খলিফা স্বয়ং অন্যান্য সাহাবাদের নিকট কুরআন-হাদিস ভিত্তিক রায় বা পরামর্শ চাইতেন। এ ব্যাপারে খলিফাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ারও পূর্ণ অধিকার ছিল। শুধু তাই নয় খলিফাদের রায়ের ভুল-ভ্রান্তি ধরে দেয়া এবং তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনা করার সাধারণ অধিকারও সর্বতোভাবে স্বীকৃত ছিল।

জনগণের স্বতস্ফূর্ততা অনুযায়ী খলিফা নির্বাচিত হতেন। জোরপূর্বক কিংবা বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী খলিফার পদ দখল করে রাখা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার শুধু খেলাফই নয় ইসলামি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে তা মারাত্মক অপরাধও বটে। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে বাদশাহী শান-শওকত কিংবা স্বৈরতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই বর্তমান ছিল না। তাঁরা নিজেদেরকে সাধারণ নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। একমাত্র খিলাফত ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়েই তাঁদের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য ও ছিল না। খলিফার দরবারে সরকারি কর্মচারি ও জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবকাশ ছিল না। এ কারণে জনগণের সাধারণ অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া অনতিবিলম্বে কোন প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ব্যতিরেকেই তার প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। এজন্য একথা উদাত্ত কণ্ঠে বলা যেতে পারে যে, খিলাফতে রাশেদাই হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র ও সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে প্রকৃত গণঅধিকার পুরোপুরিভাবেই রক্ষিত হয়েছিল।

মজলিস-ই-শুরা ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মজলিস-ই শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খলিফাগণ এ পরিষদের পরামর্শ নিতেন। শুরা গঠন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধি-বিধান ছিল না। মোহাজেরদের মধ্য হতে নবী করীম (স)-এর প্রধান সাহাবাদের নিয়ে সাধারণত শুরা গঠন করা হত। তবে কখনও কখনও নেতৃস্থানীয় আনসারগণকেও মোহাজেরদের সঙ্গে মজলিসে শুরার অন্তর্ভুক্ত করা হত। বিশেষ ক্ষেত্রে মদীনার সাধারণ নাগরিক বা প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে শুরার অধিবেশনে যোগদান করতে বলা

হত। মূলত শুরা ছিল একাধারে দেশের শাসন পরিষদ ও খলিফাগণের মন্ত্রণা পরিষদ। শুরার বৈঠক মসজিদে নব্বীতে বসত। শুরার বৈঠক ডাকার জন্য ঘুরে ঘুরে 'আসসালাতু জামেয়াতুন' (নামাজ সমবেত) বলে ঘোষণা করত। হযরত উমর (রা) বলেন, পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফতই চলতে পারে না।

বিচার বিভাগ ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিবদমান দু পক্ষের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা খলিফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হত। এ জন্য তাঁরা সব বিচার কার্যই স্বয়ং নিজেরাই সম্পন্ন করতেন। আর দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য নিজ পক্ষ হতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। প্রথম খলিফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারূক (রা) তাঁর খিলাফত আমলে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করে দিয়েছিলেন। এজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র পদমর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাযী নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। বিচারপতি রায়দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলিফার পক্ষ হতে তাঁদেরকে এ নির্দেশ দান করা হত যে, তাঁরা যে বিচারই করবেন ও যে রায়ই দান করবেন, তা যেন সর্বতোভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে হয়। কোন একদিক দিয়েও যেন ঐ মূলনীতি লঙ্ঘিত না হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা বিচারপতির উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে কিংবা প্রভুত্ব খাটাতে পারতেন না।

কাজী সরাসরি খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকে অনেক সময় বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা দান করা হত; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাযী কখনই শাসনকর্তার অধীন হতেন না। বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত। বিচারক ছাড়াও প্রত্যেক শহরেই ইসলামি আইন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একটি গণজামায়াত সব সময়ই মজুদ থাকত। কোন ব্যাপারে বিচারকদের অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে এদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করা হত।

দেশরক্ষা বিভাগ ঃ ইসলামি সাম্রাজ্য নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত ছিল। সামরিক জেলাকে বলা হতো 'জুনদ'। মদীনা, কূফা, ইরাকের বসরা ও মসুল, মিসরের ফুস্তাত ও মিসর, দামেস্ক, সিরিয়ার হিম্‌স এবং ফিলিস্তিনের সামরিক জেলা।

প্রত্যেকটি সামরিক জেলায় এক বা একাধিক সামরিক সেনানিবাস তথা ক্যান্টনমেন্ট ও গ্যারিসন ছিল। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য এ সকল সেনানিবাসে স্থায়ীভাবে সৈন্য মওজুদ রাখা হত।

সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মূল ক্ষমতা খলিফার হাতে থাকত। কেননা নবী করীম (স)-এর যামানায়ও এ রীতিই কার্যকর ছিল। তিনি নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন; কিন্তু যখন পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন বলয় বিশালতর হতে লাগল তখন খলিফাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে থাকেন। তাঁকে মেনে চলা স্বয়ং খলিফাকে মেনে চলার মতই অবশ্য কর্তব্য ছিল। যুদ্ধের অবসান হয়ে গেলে সামরিক ব্যাপারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের জন্য তাঁদেরকে ট্রেনিং দান করাই হত সেনাধ্যক্ষদের একমাত্র কাজ।

আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে সমগ্র সৈন্যবাহিনী অবৈতনিক ও স্বেচ্ছামূলক ছিল। কোন রেজিস্ট্রি বইতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালেই সৈন্য বিভাগ সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি সৈনিকের নাম রেজিস্ট্রারভুক্ত করা হয়। ফলে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কোন সৈনিক পলায়ন করে গেলে কিংবা পেছনে থেকে গেলে অতি সহজেই তা ধরা পড়ত। পলাতক সৈনিকের জন্য বিশেষ ধরনের একটি শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। তার নিজ মহল্লার মসজিদে তার নাম প্রকাশ ও প্রচার করে ঘোষণা করা হত যে, এ ব্যক্তি জিহাদের ময়দান হতে পালিয়ে এসেছে। আল্লাহর পথে আহ্বান করার ব্যাপারে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেছে। বস্তুত এটুকু ভর্ৎসনাই আরবদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও সাংঘাতিক ছিল।

হযরত উমর (রা) সমস্ত সৈনিকদের জন্য বায়তুল মাল হতে বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ বেতনের হার সমান ছিল না। ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যই ছিল মুজাহিদদের বেতন নির্ধারণের মাপকাঠি। অবশ্য শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) এ পার্থক্য দূর করে সকলের জন্য সমান মানের বেতন চালু করেছিলেন।

প্রত্যেক দশ জন সৈনিকের উপর এক জন প্রধান নিযুক্ত হত। আরবি সামরিক পরিভাষায় তাকে বলা হত 'আরীফ'। এ আরীফদের হাতেই সকল সৈনিকের বেতন অর্পণ করা হত। তারা তা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

গোটা সেনাবাহিনীকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হত। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বলা হত 'মোকদ্দমাতুল জাইশ'। যুদ্ধের সূচনা করাই হত এর দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হত 'কলব'। প্রধান সেনাধ্যক্ষ এদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। ডান পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হত 'মায়মানা' এবং বাম পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হত 'মায়সারা'। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীর নাম দেওয়া হত 'সাকাহ'। গোটা সৈন্যবাহিনী এই যে পাঁচটি উপবাহিনীতে বিভক্ত হত। একে 'খামীস' বলা হত। প্রত্যেকটি অংশের জন্য এক জন করে আমীর থাকতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন।

রাজস্ব বিভাগ ঃ মহানবী (স) এমনকি হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস খুব সীমিত ছিল। তাই রাজস্ব আয়ের জন্য নিয়মিত কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তখন রাষ্ট্রীয় তহবিলে সামান্য যা কিছু আয় হত, তা সঙ্গে সঙ্গে আবার জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। কিন্তু খলিফা উমর (রা)-এর সময় যখন বড় বড় বিজয়

অভিযানের ফলে ইসলামি সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হল তখন নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ফলে সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। এ কারণে হযরত উমর (রা) মহানবী (স) ও আবুবকর (রা)-এর প্রদর্শিত পথে ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি উশর জাতীয় কতিপয় নতুন কর ধার্য করলে তাতে ইসলামের অনুমোদিত রাজস্ব আদায়ের পাঁচটি উৎসের সঙ্গে আর একটি নুতন উৎস সংযুক্ত হল।

হযরত উমরের সময় হতে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর সাধারণত রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হত না। আদায়কৃত রাজস্ব খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী সৈনিকদের বেতন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হত। অবশিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হত। তখন দু প্রকারের রাজস্ব ধার্য করা হত। (১) স্থায়ী ও (২) অস্থায়ী। স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে যাকাত, উশর ও জিযিয়া উল্লেখযোগ্য। আর গণীমতের মাল ছিল অস্থায়ী রাজস্ব বা রাষ্ট্রীয় আয়।

খারাজ ঃ সাধারণত যুদ্ধ বিজয়ের ফলে অধিকৃত যাবতীয় চাষযোগ্য জমি এর পূর্বতন মালিকদের নিকটই থাকতে দেওয়া হত। অবশ্য উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করে নেয়া হত। একে ইসলামি পরিভাষায় বলা হত খারাজ। একে ভোগ্য খাজনা মনে করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মুদ্রা কর বাবদ ধার্য করা হত।

উশর ঃ যে সব জমির মালিকগণ ইসলাম কবুল করত অথবা যারা বিজয়ী মুসলমান তাঁদের নিকট হতে খারাজ আদায় করা হত না, সেই জমিকে বলা হত ওশরী জমি এবং এর ফসলের এক-দশমাংশ বা বিশ ভাগের একভাগ সরকারি ভাণ্ডারে জমা করা হত। মুসলমানগণ বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধের মারফতে যে সব জমি দখল করতেন, তা উশরী জমি নামে অভিহিত হত তা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।

জিযিয়া ঃ ইসলামী খিলাফতে জিম্মীদের (অমুসলিম অনুগত নাগরিকদের) নিকট হতে তাদের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ ও এর নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হত, ইসলামি পরিভাষায় তাকে জিযিয়া বলা হয়। এটা কেবলমাত্র বয়স্ক ও সুস্থ-সবল পুরুষদের নিকট হতে আদায় করা হত। নারী, শিশু, দরিদ্র ও পঙ্গুদের উপর এটা ধার্য করা হত না। হযরত উমর (রা) বহু দরিদ্র জিম্মীর জন্য বায়তুল মাল হতে বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। জিযিয়া ধার্য করা হত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর পরিমাণ ১২ দিরহামের কম ও ১৮ দিরহামের বেশি হত না।

যাকাত ঃ মুসলমানদের সকল প্রকার সঞ্চিত ধনসহ পালিত পশু, নগদ অর্থ, সম্পদ ও ফসলের উপর কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যাকাত ধার্য করা হয়েছিল। এ যাকাত রীতিমত আদায় করা হত।

শুল্ক ঃ মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রফতানি করতেন তখন তাঁদের নিকট হতে সে দেশে এক-দশমাংশ শুল্ক বাবদ আদায় করা হত। হযরত উমর (রা) যখন এটা জানতে পারলেন, তখন তিনি ইসলামি রাজ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অনুরূপ শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ দান করলেন। তাছাড়া জিম্মী ব্যবসায়ীদের নিকট হতে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সমগ্র সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা হত। তবে দুশ দিরহামের কম মূল্যের সম্পদের উপর কিছুই ধার্য করা হত না।

সার-সংক্ষেপ

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ইসলামের সোনালি যুগ। মহানবীর (স)-এর দশ বছরের শাসন আমল এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের ৩৪ বছরের শাসন আমল ছিল বিশ্বের ইতিহাসে ক্রমশ শান্তিময় গৌরবের যুগ। খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলামের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাঁদের শাসনে রাজনৈতিক, ধর্মীয় সামাজিক জীবনে অভাবনীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জন মানুষ খুবই সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে। তাঁদের শাসনামল প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.১৭

এক কথায় উত্তর দিন

১. হযরতের ইনতিকালের পর কত জন সাহাবী কত বছর পর্যন্ত তারই নীতি ও আদর্শে খিলাফাত পরিচালনা করেন?
২. খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের নাম কি কি?
৩. খিলাফাতে রাশেদীনের আমলে যাবতীয় আইন-কানুন কিসের ভিত্তিতে প্রণীত হত?
৪. কিভাবে খলিফাগণ নির্বাচিত হতেন?
৫. মজলিসে শুরা কি?
৬. বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কোন খলিফা প্রতিষ্ঠিত করেন?

৭. খিলাফত আমলে সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব থাকত কার উপর?
৮. স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে কি কি ছিল?
৯. খারাজ কি?
১০. উশর বলতে কি বুঝেন?
১১. জিযিয়া কি?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসননীতি লিখুন।
২. মজলিসে শুরা কি? লিখুন।
৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের বিচার বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।
৪. খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দেশ রক্ষা বিভাগ কেমন ছিল।
৫. খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৬. টীকা লিখুনঃ খারাজ, উশর, জিযিয়া, যাকাত।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রাথমিক ও খিলাফত লাভের বিষয় বর্ণনা করুন।
২. রিদ্দা বা স্বধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিন।
৩. রিদ্দার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখুন।
৪. খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান সংক্ষেপে লিখুন।
৫. হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ইসলামের প্রতি তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করুন।
৬. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভের বিবরণ দিন।
৭. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর বিজয় অভিযান বর্ণনা করুন।
৮. হযরত উমরের (রা) সময়ে পারস্য বিজয়ের কারণ ও ঘটনাবলী বর্ণনা করুন।
৯. দ্বিতীয় খলিফা উমরের (রা) বাইজানটাইন রাজ্য বিজয়ের বিবরণ দিন।
১০. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর শাসন নীতি বর্ণনা করুন।
অথবা, শাসন সংস্কারক হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
১১. হযরত উমর (রা)-এর চরিত্র মূল্যায়ন করুন।
১২. তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ সম্পর্কে লিখুন।
১৩. ইসলামের খিদমতে হযরত উসমান (রা)-এর অবদান বিশ্লেষণ করুন।
১৪. হযরত উসমান (রা) বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কি কি? এগুলোর পর্যালোচনা করুন।
১৫. হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণসমূহ নিরূপণ করুন।
১৬. হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল বর্ণনা করুন।
১৭. হযরত উসমান (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।
১৮. হযরত আলী (রা)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভের বিবরণ দিন।
১৯. হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে গৃহযুদ্ধের বিবরণ দিন।
২০. উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল লিখুন।
২১. হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার ফলাফল লিখুন।
২২. হযরত আলী (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
২৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা ও শাসন নীতির বিবরণ দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ৬.১ ঃ	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ক	
পাঠ ৬.২ ঃ	১.ক	২.খ	৩.ঘ	৪.ক	৫.ঘ
পাঠ ৬.৫ ঃ	১.খ	২.গ	৩.ক		
পাঠ ৬.১৫ ঃ	১.ক	২.ঘ	৩.খ	৪.ঘ	